বিদ্রোহী

রবীন্দ্রনাথ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাণী নিকেতন
২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশু কুমার দাস
২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
বাণীলেখা প্রেস
১৯, কৈলাস কবিরাজ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীজীতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিবেশক :
বাণী নিকেতন
২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণ
১৫ এপ্রিল, ১৯৬১

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "মনের খেলা" বইয়ে সরল ভাষায় সহজ ভাবে মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেছ — "রিয়লিস্ট রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে সেই তত্ত্ব বিচারকে যেন রন্ধনঘর থেকে এনে ভোজের সভায় সাজিয়েছ। সাহিত্যের সংসারে এর মধ্যে সাহিত্যরস জমে উঠেছে — যাদের রস গ্রহণের শক্তি আছে তাদের কাছে উপাদেয় হবে। গল্পের মধ্যে লেখকের অলক্ষ্য মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে — তুমি তাকে প্রকাশিত করেছ কিন্তু দুঃশাসনের পীড়নে তার আব্রু নষ্ট হয় নি। দুর্গত বুদ্ধিতে ও বিজ্ঞানের জোর করে সেই রকম সাহিত্যের আব্রু নাশের দৃষ্টান্ত প্রচুর পেয়েছি। যে হেতু দুরূহতার কৃত্রিম বিভীষিকার সেইখানে এরকম আয়োজন অত্যন্তই সহজ। ইতি ৭।১০।৩৩

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সুশান্তবাবুর" যে সমালোচনা
করেছ তাতে খুসি হয়েছি।
প্রশংসায় সকলেই খুসি হয়
কিন্তু নিপুণ প্রশংসায় খুসি হবার
কারণ আরো ঘনীভূত হয়ে থাকে।
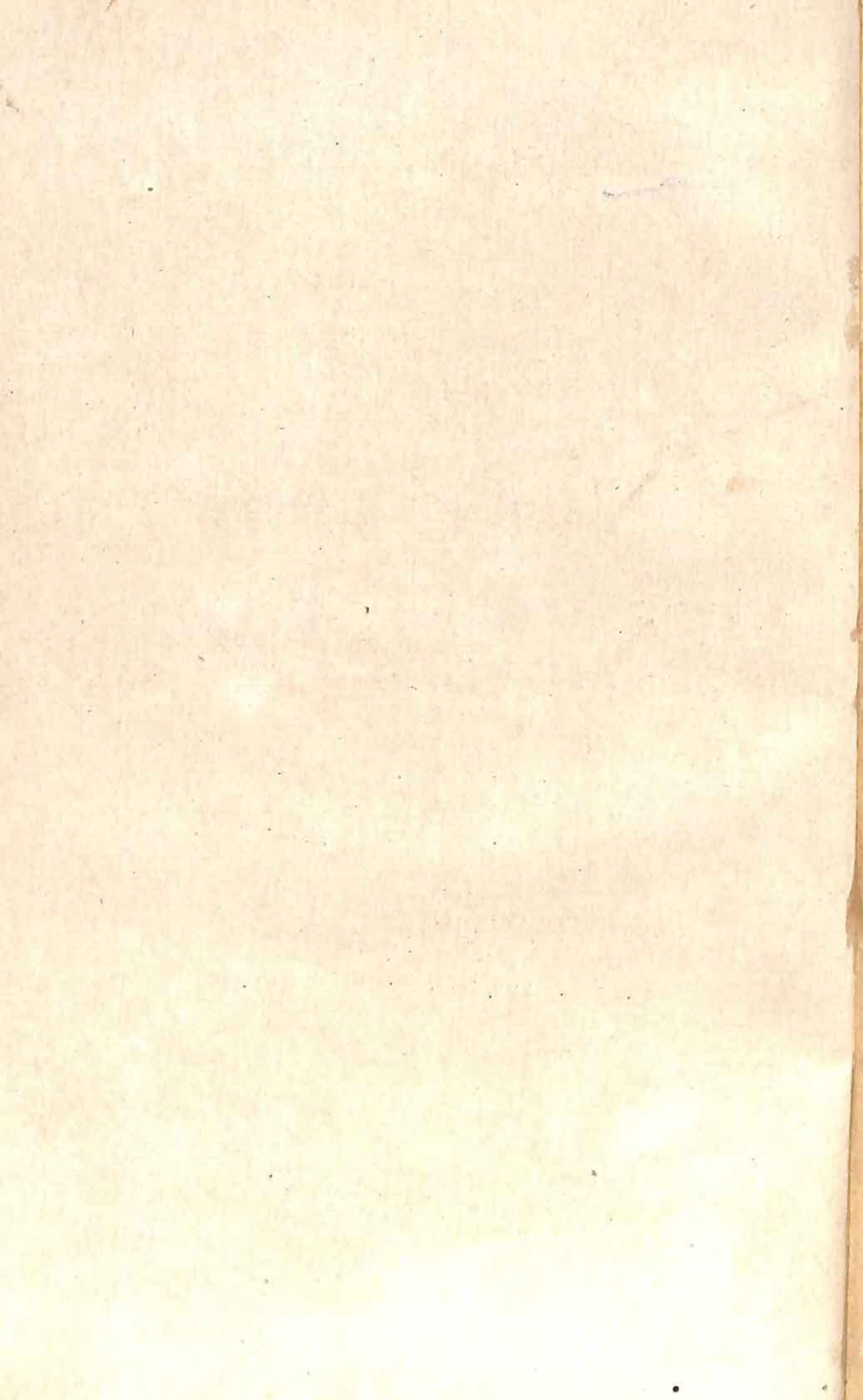
আমার পরমস্নেহাস্পদ সাহিত্য রসিক, আমার দুঃখ সুখের সাথী
শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্রের করকমলে—

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল
১৬ই এপ্রিল, ১৯৬১

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ বাহির হোলো। তেমন কোন শ্রুতিমধুর প্রতিশব্দ খুঁজে না পাওয়ায় মাতৃভাষার সঙ্গে বিদেশী ভাষা জুড়ে দিতে হয়েছে। ভাষার উপরে এই অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার অনুপ্রাসের খাতিরে অসহনীয় নাও হ'তে পারে।

কবির কাছে সে দিন ভয়ে ভয়ে পুস্তকের নামটা প্রকাশ করতেই তিনি বললেন, "নামে আমার কোন আপত্য নেই, তুমি জেলে না গেলেই হোলো।" এই উক্তির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একখানি বই লিখেছিলাম। পুস্তকের ললাটে 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটির পূর্ব্বে যে কথাটি ব্যবহার করেছিলাম তা, বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে থাকবে। তাঁরা অনতিবিলম্বে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন—যার ফলে বইখানি চক্ষের নিমিষে বাজার থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি নিজেও তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ করুণা ক'রে মড়ার উপরে আর খাঁড়ার আঘাত করলেন না। বই বাজেয়াপ্ত হোলো। শুধু অর্থদণ্ডের উপর দিয়ে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল।

সেই থেকে ভেবেছি, ইংরেজ-রাজত্বে 'বিদ্রোহী' কথাটা লেখার মধ্যে সজ্ঞানে আর কখনও প্রয়োগ করবো না। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী-রূপ যাঁরা সহ্য করতে পারেন নি সেদিন, আশা করি, কবির নিরীহ রিয়লিষ্ট-রূপ আজ তাঁদের কাছে ভয়াবহ হ'য়ে দেখা দেবে না। এবারে তাঁর লেখা-সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেবল মনোবিকলন-তত্ত্বের (Psycho-analysis) দিক থেকে। সুতরাং ন ভেতব্যম, ন ভেতব্যম।

ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মনের অতল-প্রদেশের যে সব রহস্য ধরা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কবির দৃষ্টি থেকে সে সব রহস্য এড়িয়ে যেতে পারে নি। একজনের পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক; আর একজন মানুষের মনের জীবনকে বুঝেছেন শিল্পীর সহজ অনুভূতি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লেখাগুলি পড়তে পড়তে বারে বারে ফ্রয়েডের কথা মনে হয়েছে। ফ্রয়েডের দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে। এ ব্যাখ্যা অন্যের কাছে কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুসী হয়েছেন এবং একাধিক পত্রে সেই খুসীর কথা জানিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আশাতিরিক্ত পুরস্কার আগেই মিলে গেছে। কবির মত পাঠক-পাঠিকাগণও যদি লেখা প'ড়ে খুসী হন, আমার আনন্দ কানায় কানায় ভ'রে উঠবে।

আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ আগা-গোড়া দেখে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—:*:—

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হোলো। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ দিনে দিনে বাড়ছে, বইখানির বহুল প্রচার তার একটি প্রমাণ। কাগজের দুর্ভিক্ষ না এলে বইখানিকে বাজারে বাহির করা যেতো অনেক আগেই। যুদ্ধ কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুর্য্যোগ এনেছে। পাঠকপাঠিকাগণকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

ঐ চলেছে কলরবমুখর জীবনের বিচিত্র শোভাযাত্রা। প্রাণের উৎসবক্ষেত্র থেকে দূরে আমার দিন কাটে রোগশয্যায়। কর্ম্মের ফেনিল উন্মাদনায় ভুলেছিলাম কাজ গৌণ, মুখ্য আর-কিছু। জীবন উদ্যানের একটা ছায়াময় দিক আছে। সেখানে কি শুধুই ছায়া? সেই ছায়ার সঙ্গে কি জড়িয়ে নেই আলো? দুঃখ খুলে দেয় সেই আলোর স্বর্ণদ্বার '

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথের পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে পরমস্নেহাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র তাঁর কাছে ঋণী করলেন আমাকে। তাঁর উদ্যোগে এবং প্রেরণাতেই বইখানি আবার আলোর মুখ দেখলো। গত চৌদ্দ পনেরো বৎসর ধ'রে আর কোন দিকে চাইবার অবসর ছিলনা। নদীয়ার বড় আন্দুলিয়ার দক্ষিণপ্রান্তে এক নির্জ্জন প্রান্তরে চলেছিল কাপালিকের শব-সাধনার পালা। সাধনা ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলিনে। ফলবতী হয়েছে এমন কথাও নয়। স্বপ্নের কতটুকুকেই বা আমরা ফলবান করতে পারি? যা পারিনি করতে তাই তো পর্ব্বত-প্রমাণ! তবু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন শুধু কর্ম্ম দিয়ে কি আমাদের বিচার করেন?

ব্রাউনিং-এর সেই অপূর্ব্ব উক্তি :—

All I could never be,
All, men ignored in me,
This, I was worth to God, whose wheel
the pitcher shaped.

একদা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অমৃতহ্রদে সত্যিই আকণ্ঠ ডুবে ছিলাম। সেই সাহিত্যের সুধা সাধ মিটিয়ে পান করেছি। সেই সুধা সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আস্বাদন করবার জন্যে লেখনীরও আশ্রয়

নিয়েছি। কিন্তু মন শহরের পাষাণ-মরুর বক্ষ থেকে মুক্তি চাই ছিল পল্লীর শ্যামল প্রকৃতির ক্রোড়ে। সেই মুক্তি এলো কিন্তু রণদামামার গর্জ্জনের মধ্যে। রবিঠাকুরের চেলাদের গ্রহণ করবার জন্যে গ্রাম প্রস্তুত ছিল না। এখনও কি প্রস্তুত? পরম পাকা প্রবীণেরা মৃত অতীতের ধ্বজা উড়িয়ে ছুটে এলো 'মার' 'মার' শব্দে। লাগলো নূতনের সঙ্গে পুরাতনের নির্ম্মম সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে আমার হাতে ধনুঃশর, আমার স্ত্রী ধরলেন অশ্বের বল্‌গা। তিনি ছিলেন সেদিন আমার রথের সারথীর ভূমিকায়। নারী যে পুরুষের শক্তি এ সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে আমি উপলব্ধি করেছি। মানুষের জগত থেকে যখন নিষ্ঠুর আঘাতের পর আঘাত পেয়েছি মাটির কোলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কেঁদেছি। আকাশের নীল, বনের সবুজ, প্রান্তরের অবারিত মুক্তি, পাখীর কাকলি, তরু-মর্ম্মর আর নদীর কলধ্বনি অপমানে দিয়েছে সান্ত্বনা, বেদনায় দিয়েছে শান্তি! প্রকৃতির সাহচর্য্য ভুলিয়ে দিয়েছে রক্তাক্ত হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ।

এই রণ-পর্ব্বের কলকোলাহলের মধ্যে বইগুলির পুনঃ প্রকাশের কোন অবকাশই ছিলনা। কৃষ্ণ মহাপাত্র না এলে রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ আজও নেপথ্যের অন্ধকারেই থেকে যেতো। কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি মহাপাত্রকে শতায়ু করুন।

প্রুফ দেখতে দেখতে নিজের লেখার সঙ্গে নতুন ক'রে আবার পরিচয় হোলো। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ মনীষী Spengler-এর The Decline of the West পড়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে একটা জায়গায় খুঁজে পেলাম রবীন্দ্রনাথের আর বার্ণার্ড শ'য়ের আশ্চর্য্য মিল। মেয়েদের সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গিমা। Spengler লিখেছেন, Policy for woman is eternally the conquest of the man. পুরুষকে জয় করাই নারীর চিরদিনের সাধনা। পুরুষের পোলিটিক্সে নারীর বিতৃষ্ণা মজ্জাগত। মেয়েরা মহামায়ারই অংশ। সন্তান-সৃষ্টির এবং সন্তান-পালনের জন্যেই তারা এসেছে সংসারে।

মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে জীবনকে সৃষ্টি করে তারা। সৃষ্টির সেই অসহ্য বেদনা কি রণক্ষেত্রে কামানের খাদ্য যোগানোর জন্যে? সূতিকাগৃহে প্রাণকে তারা সৃষ্টি করবে—সে কি যুদ্ধদানবকে নরবলিতে তুষ্ট করবে ব'লে? Spengler তাই লিখেছেন: What for her is a triumphant battle that annihilates the victories of a thousand childbeds? যে যুদ্ধ তার সহস্র সন্তানসৃষ্টির কীর্ত্তিকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয় তা' জয়-গৌরবে মণ্ডিত হ'লেও কি তার মূল্য থাকতে পারে নারীর কাছে? দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের যাত্রাপথের ধারে ধারে ফ্রান্সের জননীরা একদা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল সম্মার্জ্জনী দেখিয়ে। চেম্বার্লেন যখন হিটলারের সঙ্গে মিউনিকে সন্ধি ক'রে ছাতাবগলে স্বদেশে ফিরে এলেন ইংরেজ মেয়েদের সে কী উল্লাস! Spengler ঠিকই লিখেছেন: Man's history sacrifices woman's history to itself. তাই পুরুষের পোলিটিক্স্‌কে নারীরা কখনোই সুনজরে দেখতে পারেনি। তার ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে নারীর ইতিহাস কি যুগে যুগে বলি হয়নি?

হয়তো সেই দিন এসেছে পৃথিবীতে যখন মানুষের নূতনতর ইতিহাস রচনায় পুরুষ নয়, নারী নেবে প্রধান ভূমিকা। পুরুষের বুদ্ধির ঔদ্ধত্য তা'র হৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার ক'রে যখন নিত্য নব নব মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করছে, টেক্‌নলজিকে লাগিয়েছে মৃত্যুর সেবায় তখন জীবনকে বিপন্ন ক'রে জীবনকে যে সৃষ্টি করে সেই নারীই হয়তো আনবে সভ্যতায় রূপান্তর তার মমতার সোনার কাঠির স্পর্শে।

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল
জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস
১৩ই এপ্রিল, ১৯৬১

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দুইবোন

দুইবোন রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাস। উপন্যাস যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখানে দেখতে পাই, শশাঙ্ক ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারী পদে একটিনি করছে। চাকরির কাজে সে পাকা। সাধারণ বাঙালীর ছেলে ভালো সরকারী কর্ম্মচারী হলে যা হয়ে থাকে, শশাঙ্ক তার থেকে স্বতন্ত্র নয়। মন দিয়ে কাজ করে, বাড়ীতে এসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে 'ব্রিজ' খেলে, চাকরিতে ক্রমোন্নতির স্বপ্ন দেখে, বিপদ আঘাতকে এড়িয়ে নিরাপদ রাস্তায় চলতে চায়। শশাঙ্কের ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেন্সনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা। আত্মসম্মানের চাইতে শান্তির উপরই তার আসক্তি বেশী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্ম্মিলার বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; জলভরা নব-মেঘের মত নধর দেহ; স্নিগ্ধ-শ্যামল সিঁথিতে সিঁদূরের অরুণ রেখা। স্বামীর জীবনলোকে এমন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল শশাঙ্কের পরিচর্য্যায় শর্ম্মিলার মকরমুখো মোটা দুটী বালা-পরা হাত সদাই ব্যস্ত বন্ধুমহল থেকে স্বামীর ঘরে ফিরতে যদি একটু রাত হয়ে যায়, শর্ম্মিলার উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কি জানি, ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে যদি দুর্য্যোগ ঘটে। লণ্ঠন দিয়ে মহেশ-চাকরকে পাঠায় শশাঙ্ককে আনতে। বাইরের ঘরে শশাঙ্ক লোকের সঙ্গে কাজের কথায় ব্যস্ত; এদিকে ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে চিরকুট আসছে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল! আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" এক কথায় শর্ম্মিলা হচ্ছে সেই

জাতের মেয়ে যারা প্রধানত মা। সে নিবারণ করে তাপ, দূর করে শুষ্কতা, ভরিয়ে দেয় অভাব, মেঘের মত ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেয় বিগলিত ক'রে।

স্ত্রীর অতি-লালনের আওতায় স্বামীর দিন কেটে যায় নিরুদ্বেগে। এমন সময় শশাঙ্কের চাকরির জগতে ঘটলো বিপর্য্যয়। তার আসন্ন উন্নতির দাবীকে অবহেলা ক'রে, এক ছোকরা-বয়সী ইংরেজকে বসানো হ'লো তার সামনে। এই অসম্মানের খবরটা যখন শর্ম্মিলার কানে পৌঁছালো—সে স্বামীকে বললে চাকরি ছেড়ে দিতে। অনেক সঙ্কোচের পর নাছোড়বান্দা পত্নীর নির্দ্দেশে শশাঙ্ক পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলো।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে শশাঙ্ক শর্ম্মিলার প্রেরণায় স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করে দিলো মথুরদাদার সঙ্গে। মথুরদাদা শর্ম্মিলার জ্ঞাতি-ভাই, কলিকাতার একজন বড়ো কণ্ট্রাক্টর। পূর্ণ উদ্যমে ব্যবসা চলতে লাগলো; শশাঙ্ক উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতন বাড়ী খাড়া করলো ভবানীপুরে; কিন্তু শশাঙ্কের এই কর্ম্মোন্মাদনা তাকে সরিয়ে নিল শর্ম্মিলার কাছ থেকে অনেক দূরে। শর্ম্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড় পরব শশাঙ্কের জন্মদিন। কিন্তু উৎসবের ক্ষেত্রে দেখা গেল—শশাঙ্ক নেই। "দেখ শর্ম্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা করো না"—এই বলে শশাঙ্ক শর্ম্মিলার স্বপ্নকে বিফল ক'রে তার জন্মদিনে চলে গেল 'বিজনেস' করতে। শর্ম্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে। ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্ম্মধারার পারে দাঁড়িয়ে স্ত্রী চেয়ে দেখে—তার পরপারে স্বামীর কাজের রথ ধেয়ে চলেছে দুর্ব্বার গতিতে।

এই সময়ে শর্ম্মিলাকে হঠাৎ ধরলো দুর্ব্বোধ এক রোগে। নানা ডাক্তার লাগলো নানাদিক থেকে—ব্যাধির আবাস-গুহাটা খুঁজে বের করতে। দারুণ উৎকণ্ঠায় শশাঙ্ক দিন যাপন করতে লাগলো।

এদিকে নিজের কর্ত্তব্য নিয়ে শর্ম্মিলারও উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সংসারে মহা-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। অবশেষে শর্ম্মিলা নিরুপায় হয়ে পিতৃগৃহ থেকে ছোট বোন উর্ম্মিমালাকে নিয়ে এল আপনার সংসারে। দিদির গৃহ-রাজ্যে উর্ম্মি পেল প্রতিনিধিপদ। উর্ম্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়। তবুও সংসারের নানা কাজের মধ্যে তার আনন্দ অপার।

উর্ম্মিকে সংসারের মধ্যে পেয়ে শশাঙ্কের জীবনে নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগল। কাজ শেষ হ'লেই, এমন কি না হলেও বাড়ীতে ফিরে আসবার জন্য ওর মন উৎসুক হয়ে উঠে। সন্ধ্যাবেলায় রেডিওর কাছে কান পাতবার জন্য শশাঙ্ক মজুমদারের কোনদিনই উৎসাহ ছিলো না। কিন্তু উর্ম্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। শর্ম্মিলা যখন ভালো ছিল শশাঙ্ক কোনদিনই নিউমার্কেটে 'শপিং' করতে যেতো না। উর্ম্মির সঙ্গে নিউমার্কেটে যেতে শশাঙ্কের এখন উৎসাহের অভাব নেই। শশাঙ্ক যখন বাড়ী তৈরীর 'প্ল্যান' নিয়ে পড়ে—উর্ম্মি তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে, বুঝিয়ে দাও। আফিস ঘরে ব'সে উর্ম্মির সঙ্গে তাস খেলতেও শশাঙ্কের কর্ত্তব্যবোধে এখন বাধা লাগে না। নষ্ট সময়ের জন্য অনুতাপ করে—কিন্তু নিজে থেকেই উর্ম্মির সঙ্গে সময় নষ্ট করার সুযোগ সে সংগ্রহ ক'রে নেয়।

রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে শর্ম্মিলা দেখতে লাগলো—শশাঙ্কের আহার-বিহার বেশ-ভূষার চিরাচরিত ব্যবস্থার নানারকম ত্রুটী। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই ক'দিনেই এত বড় সাধনার আসন থেকে কর্ম্ম-কঠিন স্বামীকে বিচলিত ক'রে দিলে—এ দৃশ্য শর্ম্মিলার প্রাণকে পলে পলে দগ্ধ করে। অবশেষে মথুরদাদা এসে শর্ম্মিলাকে একদিন সন্তর্পণে জানালো, কারবারের অবস্থা খারাপ। কাজকর্ম্মের প্রতি শশাঙ্কের ঔদাসীন্যের জন্যই বাজারে তাদের খ্যাতি হয়েছে নষ্ট। শশাঙ্কও কিছুদিন যাবত বুঝতে পারছিলো—এটা ভালো হোচ্ছে না।

ঊর্ম্মির প্রতি তার অন্তরের দুর্ব্বার অনুরাগ ভুলিয়ে দিচ্ছিল তার কর্ত্তব্যবোধ। বুঝতে পারছিল সর্ব্বনাশ আসছে এগিয়ে। কিন্তু শশাঙ্ক তখন ঊর্ম্মির প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সংসারের সমস্ত দাবী, সমস্ত ভয়-লজ্জা এই প্রেমের কাছে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। প্রতিদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে ভাবতো—এখন থেকে সাবধান হবে। কিন্তু পরের দিন আবার সে ঊর্ম্মিকে নিয়ে ছুটতো সিনেমায় আর ফুটবল ম্যাচে। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শর্ম্মিলা বারবার ক'রে বলে, "আর কেন আছি বেঁচে।"

উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাঠক-পাঠিকার মনে আনন্দের তরঙ্গ তুলে শর্ম্মিলা রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। শশাঙ্কের মন থেকে ঊর্ম্মির মোহ তখনও যায় নি—এমন কি, তাকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প রয়েছে তার মনে। কিন্তু ঊর্ম্মি নিজে থেকেই শশাঙ্ককে মুক্তি দিয়ে বিলাত যাত্রা ক'রেছে ডাক্তারি শিখবার জন্য। যাবার আগে শশাঙ্ককে চিঠি লিখে গেছে, "আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলাতে। বাবার আদেশ মত ডাক্তারী শিখে আসবো। ছয়সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্য ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইলো মনে।"

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে-শক্তিকে স্বীকার করেছেন, তাকে আমরা বলতে পারি মানুষের স্বভাবের আদিম প্রবৃত্তির দুর্ব্বার শক্তি। সেই শক্তির উদ্দামতা শশাঙ্ক আর ঊর্ম্মি—দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেখানে সেখানে গৌরব নেই, লোকলজ্জা নেই, কর্ত্তব্য-বোধ নেই, রুগ্না সহধর্ম্মিণীর জন্য সহানুভূতি পর্য্যন্ত নেই। শর্ম্মিলার প্রতিমুহূর্ত্তের বেদনা শশাঙ্কের চোখেই পড়লো না। অথচ এই শর্ম্মিলার পিতা রাজারামবাবুর সাহায্যেই এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে

সে—এই শর্ম্মিলার টাকা ধার নিয়েই সে গড়ে তুলেছিল ব্যবসায়। এই শর্ম্মিলাই সুখে তার সঙ্গে হেসেছে, দুর্দ্দিনে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিয়েছে, তার ঘুমন্ত আত্মসম্মানবোধকে জাগিয়ে তুলেছে, তার ঘরের গৃহিণী হ'য়ে সহস্র কাজের মধ্য দিয়ে বৎসরের পর বৎসর ধরে তার পরিচর্য্যা করেছে।

উর্ম্মিমালার আচরণও কি অদ্ভুত! লেখা-পড়া-শেখা মেয়ে—যাকে বলে বিদুষী। তার উপর বনেদী ঘরের মেয়ে। অন্তঃকরণও তার কত উঁচু। অগ্রজ হেমন্তের রোগ-শয্যায় দিনরাত্রি উর্ম্মি ভায়ের সেবা করেছে। ইউরোপ গিয়ে ডাক্তারী শিখে ফিরে এসে বাবার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ভার নেবে সে—এই তার সঙ্কল্প। তদুপরি নীরদের বাকদত্তা বধূ সে। সর্ব্বোপরি রোগ-শয্যায় শায়িতা অসহায় দিদির সংসার দেখবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সে ভগ্নীপতির গৃহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অবশেষে দিদির সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করতে হল সে উদ্যত। রক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এলো যে, সে আত্মপ্রকাশ করলো ভক্ষকের মূর্ত্তিতে। দিদির সংসারে সে আগুন লাগিয়ে দিলো। সেই আগুনে শশাঙ্কের পৌরুষ গেল ভস্মীভূত হ'য়ে, তার কারবার গেল ধ্বংসের মুখে, ভগিনীর সৌভাগ্য গেল উড়ে পুড়ে। শশাঙ্কের কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারি সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ কাছে-পাবার জন্য উর্ম্মি কেবলই ভিতরে ভিতরে ছটফট করতো। অবৈধ ভালোবাসার দুরন্ত নেশা শশাঙ্কের মত পুরুষকে এবং উর্ম্মির মত নারীকে এমনভাবে পেয়ে বসলো কেমন করে? আশ্চর্য্য লাগে প্রথমটা—কিন্তু ভাল ক'রে মানুষের চরিত্রকে তলিয়ে দেখতে গেলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই এতে। মানুষকে আমরা দেবতারূপে চিত্রিত করে যত আনন্দ পাই না কেন—আসলে দেবতা হওয়ার লোভের চাইতে আনন্দ পাওয়ার লোভই তার মনকে বেশী করে

জুড়ে আছে। এই আনন্দের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগকেই ফ্রয়েড বলেছেন—Pleasure-principle. এই Pleasure-principle বলতে ফ্রয়েড কি জানাতে চেয়েছেন—এখানে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে। ফ্রয়েড বলছেন—We may only venture to say that pleasure is in some way connected with lessening, lowering or extinguishing the amount of stimulation present in the mental apparatus ; and the pain involves the heightening of the latter. মানুষের মনের চাঞ্চল্য যাতে কমিয়ে দেয় তাই হচ্ছে আনন্দ আর সেই চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ার নামই দুঃখ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের মনে যত রকমের উত্তেজনা আছে—তার মধ্যে সবচেয়ে বড় উত্তেজনা হ'চ্ছে পুরুষকে আলিঙ্গন-পাশে বাঁধবার জন্য নারীর এবং নারীকে সবল কঠিন বাহুর মধ্যে বাঁধবার জন্য পুরুষের মনের উত্তেজনা। The beast in man and woman though tamed by centuries of civilisation, and as cowed as the wretched lions in the tamer's cage, is always thinking of its food.* এই উত্তেজনা যতক্ষণ শান্ত না হ'চ্ছে ততক্ষণ পুরুষের বা নারীর মনের মধ্যে রয়েছে কান্না। কোন কিছুতেই তার মন বসে না। মন সদাই করে উড়ু উড়ু। উর্ম্মির মনের মধ্যে পুরুষের জন্য এই কান্না, শশাঙ্কের মনের মধ্যেও নারীর জন্য এই কান্না। মানুষের চরিত্রে দেবতার আর দানবের কী অদ্ভুত মিশেল! মাটি আর নক্ষত্রখচিত আকাশ—দুইএরই মিশ্রণ তার স্বভাবে। স্বর্গের আর নরকের মাঝামাঝি সে যেন ত্রিশঙ্কু। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের ভাষায় Man is a child of earth and of the starry heaven.

* John Christopher—Romain Rolland.

নীরদ উর্ম্মির মনের এই কান্নাকে যদি থামিয়ে দিতে পারতো তবে শশাঙ্কের দিকে তার মন এমন ক'রে ছুটতো না। কিন্তু নীরদের মনটা হ'চ্ছে ইস্কুল মাষ্টারের মন। সে উপদেশ দিতে পারে, আনন্দ দিতে পারে না। সে উর্ম্মিকে শুধু চালনা করে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওর সাধনা করে না। নীরদ নীরস—হাসতে জানে না, আনন্দের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেবার শক্তি নেই তার। তার প্রাণের গভীরতম রহস্য উর্ম্মির কাছে একদিনের জন্যও ধরা দিলো না। নীরদের চোখে উর্ম্মি একমুহূর্ত্তের জন্যও দেখলো না আবেশ। উর্ম্মির কাছ থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে দূরে দাঁড়িয়ে সে তার বিচার করেছে, আপনাকে ভুলে গিয়ে সে উর্ম্মির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারেনি। এমন মানুষকে মেয়েরা পছন্দ করতে পারে—ভালবাসতে পারে না। নিজেকে ভুলতে না পারলে কি মেয়েদের মন পাওয়া যায়? Self-consciousness is fatal to love. The self-conscious lover never "arrives." The woman looks at him and then she looks at something more interesting.* সেই মানুষকেই মেয়েরা ভালোবাসে যার স্বভাবের মধ্যে নেই কার্পণ্য, যার প্রেমের মধ্যে নেই অবসাদ, প্রতি প্রভাতে যে প্রেয়সীকে নূতন ক'রে পাওয়ার জন্য সাধনা করতে পারে যেমন ক'রে বীর সাধনা করে স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য। এমন একটা পুরুষের কাছে ধরা দেওয়ার জন্য উর্ম্মি ভিতরে ভিতরে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। এই অস্থিরতার সময়ে শশাঙ্কের সান্নিধ্যে এসে পড়লো সে।

শশাঙ্কের মনটাও ছিল ক্ষুধিত। শর্ম্মিলার ভালোবাসার মধ্যে বাৎসল্য-ভাবটাই বেশী ক'রে ফুটে উঠেছিল। অক্লান্ত সেবার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল শশাঙ্কের প্রতি তার নারী-

* Love's Coming-of-Age—Edward Carpenter.

হৃদয়ের সুনিবিড় অনুরাগ। কিন্তু পুরুষের হৃদয় নারীর কাছ থেকে শুধু সেবা পেয়ে তৃপ্তিলাভ করে না। ভালো যত ভালোই হোক, তার মধ্যে নূতনত্বের বৈচিত্র্য থাকা চাই ; নইলে সে আনন্দ দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মেয়েদের খেয়ালের আবর্ত্তে প'ড়ে পুরুষদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়, তবুও খেয়ালী মেয়েদেরই তারা ভালোবাসে। এই ভালো লাগার হেতু তাদের স্বভাবের বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য যাদের স্বভাবে আছে সেই সব খেয়ালী মেয়েদের আমরা খুন করতে পারি, কিন্তু ত্যাগ করতে পারি নে। শর্ম্মিলার চরিত্রে এই পরিবর্ত্তনশীলতার অভাব ছিল। এই জন্যই শশাঙ্কের কাছে শর্ম্মিলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। পুরুষ যাকে ভালোবাসে তার মধ্যে দেখতে চায় প্রিয়ার রূপ। সেই প্রিয়া চপল-হাসির তরঙ্গ তুলে ভুলিয়ে দেবে তার কাজ। তাকে গোপন ইসারায় ডেকে নিয়ে যাবে একান্তে, মালা গেঁথে পরিয়ে দেবে তার গলায়, প্রাণে ঢেলে দেবে বাঁশির সুর, তার রক্তে জাগাবে কাঁকনের রিনিরিনি ধ্বনি। শর্ম্মিলার ভালোবাসায় প্রিয়ার এই চপলতার ভাবটা ছিল না। তার একঘেয়ে সেবার অত্যাচারে শশাঙ্কের প্রাণটা উঠেছিল হাঁপিয়ে। অন্তঃপুরের সেই অত্যাচার থেকে তাকে মুক্তি দিল বাহিরের কাজ। কিন্তু কাজ দিয়ে কি মানুষের অন্তরের চঞ্চলতায় শান্তি আনা যায়? নীরস পথে কাঞ্চনকে লক্ষ্য ক'রে শশাঙ্কের কাজের রথ যখন উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছিল তখন সামনে এসে উপস্থিত হলো উর্ম্মিমালা। পুরুষের ক্ষুধিত বুকের মধ্যে রক্তধারা অকস্মাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

উর্ম্মি! উর্ম্মি! উর্ম্মি! উর্ম্মি এসে ধীরে ধীরে শশাঙ্কের পিপাসু হৃদয়কে জুড়ে বসলো। উর্ম্মি না হলে তার চলে না। রুগ্না স্ত্রীর ছোট বোনটীকে কাছে কাছে রাখবার জন্য এই যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা—এই আকাঙ্ক্ষা তো আর কিছুই নয়। এ

হ'চ্ছে প্রিয়াকে বাহুপাশে বাঁধবার জন্য প্রেমিকের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা। শর্ম্মিলা শশাঙ্কের যে অভাব ঘুচাতে পারেনি—সেই অভাবকে ঘুচালো উর্ম্মিমালা। কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে এমনভাবে কামনা করা সমাজধর্ম্মের বিরোধী। লোকালয়ের মধ্যে বাস ক'রে মনের সমস্ত ইচ্ছাকে যথেচ্ছভাবে চরিতার্থ করা চলে না। তাতে আনন্দ উপভোগে বিঘ্ন ঘটে। মানুষ একদিকে যেমন আনন্দ ভোগ করতে চায়, আর একদিকে তেমনি দুঃখকে এড়িয়ে চলতেও ইচ্ছুক। বাস্তব জগতের কঠিন আঘাতকে সাধ করে কে আর বরণ করতে চায়? তাছাড়া বিবেক-বুদ্ধি ব'লেও তো কিছু আছে মানুষের মনে।

শশাঙ্ক পড়লো উভয়সঙ্কটের মধ্যে। উর্ম্মিকে না হ'লে যেমন তার এক মূহূর্ত্তও চলে না—উর্ম্মিকে পেতে গেলেও তেমনি বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়। এমন অবস্থায় বাস্তব সত্যের সঙ্গে রূঢ় ধাক্কা খেয়ে মানুষ চিরকাল ধ'রে যা ক'রে এসেছে, শশাঙ্কও তাই করলো। শর্ম্মিলার দিকে চেয়ে, সমাজের দিকে চেয়ে, নিজের দিকে চেয়ে উর্ম্মিকে সোজাসুজি প্রেয়সীরূপে গ্রহণ না ক'রে সকল সময়ের জন্য নিজের কাছে কাছে তাকে রেখে দিয়ে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজটা সম্পন্ন করতে লাগলো। সমস্ত ক্ষুধাটা মিটলো না বটে—কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভালো। আমাদের মধ্যে অহং (ego) বলে যে পদার্থ আছে সেই অহং তিক্ত-প্রয়োজনের তাড়নায় অনেক সময় অন্তরের এবং দেহের প্রচণ্ড ক্ষুধাকেও অতৃপ্ত রাখে, বিরহের বেদনাকে দায়ে পড়ে স্বীকার ক'রে নেয়, ভোগের দিনকে দূরে দূরে ঠেকিয়ে রাখে। অহং-এর এই যে যুক্তির দ্বারা চালিত হওয়ার শুভবুদ্ধি, ফ্রয়েড এই শুভবুদ্ধিকে বলেছেন—Reality-principle. এই সম্পর্কে ফ্রয়েড লিখছেন, Thus trained the ego becomes "reasonable", is no longer controlled by the pleasure-principle, but follows the reality-principle,

which at bottom also seeks pleasure—although a delayed and diminished pleasure, one which is assured by its realisation of fact, its relation to reality.*

শশাঙ্ক শর্ম্মিলার স্বামী, ঊর্ম্মি শর্ম্মিলার ভগ্নী—এই কঠিন সত্য শশাঙ্কের ভোগের ইচ্ছার পথে পর্ব্বতের মত খাড়া হ'য়ে রইলো। দিবা-নিশি তার মধ্যে চলতে লাগলো সংগ্রাম, অহং-বুদ্ধির সঙ্গে যৌন-ক্ষুধার সংগ্রাম, ফ্রয়েডের ভাষায়, Ego instincts-এর সঙ্গে Sexual instincts-এর সংগ্রাম। ঊর্ম্মিও প্রবৃত্তির ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মধ্যে পাক খেতে লাগলো। নিজেকে যতদিন পারলো ভুলিয়ে রাখলো—কিন্তু অবশেষে এই সত্য তার মনের কাছে ধরা দিলো যে সে শশাঙ্ককে ভালোবেসেছে। ঊর্ম্মির মনের ভাবটাকে ঔপন্যাসিক অপরূপ ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এখানে তা তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। "জানালার কাছে ঊর্ম্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসে না কিছুতেই, বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবী-লতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা,—সেই বেদনা যেন ঊর্ম্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেচে।" বেচারা ঊর্ম্মি! কি করবে সে? যে সৃষ্টির উন্মাদনা বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে—সেই সৃষ্টির আহ্বান এসে পৌঁচেছে তার তরুণ রক্তে। ভেসে যায় সে! ভেসে যায় শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজধর্ম্ম, পিতার আদেশ, দিদির সংসার, ভগ্নীপতির কারবার—সব ভেসে যায়! নিজেকে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে। সৃষ্টির উন্মাদনা তরুণীর রক্তের মধ্যে জেগে তাকে পাগল ক'রেছে।

শশাঙ্ক যদি খুব শক্তিমান পুরুষ হোতো—সে সুরুতেই ঊর্ম্মির

* Introductory Lectures on Psycho-analysis—Freud. p. p. 299.

কাছ থেকে জোর ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিতো, যেমন ক'রে উর্ম্মি নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিলাত চলে গেল। কিন্তু খুব কম মানুষেই তা পারে। মনে করে, অবাধে মিলে-মিশেও মনকে আর দেহকে নিষ্কলুষ রাখবে। কিন্তু তা হয় না। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে মন হারিরে ফেলে নিজের চেতনা, আবেশে বিহ্বল হ'য়ে সে ভুলে যায় সাংসারিক দায়িত্ব। শশাঙ্ক উর্ম্মিকে দূরে রাখতে পারলো না। একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে উর্ম্মির হাত ধরে সে বলে ফেললো, "তোমাকে ভালবাসি।"

সংসার সত্যিই জটিল। নিজেকে আমরা যে কত রকম ক'রেই ভুলিয়ে রাখি! আর কতটুকুই বা আমরা জানি নিজেদের মনকে! বেচারা উর্ম্মি কি প্রথমে জানতো—রুগ্না দিদির পরিচর্য্যা করতে এসে ভগ্নীপতিকে সে গোপনে ভালোবেসে ফেলেছে? শশাঙ্কই কি জানতো—শেষ পর্য্যন্ত উর্ম্মির প্রেমে তার পৌরুষ এমন ক'রে ভেসে যাবে? অথচ এমন তুর্ঘটনা অহরহ কতই না ঘটে যাচ্ছে। কত গোবিন্দলাল, কত শশাঙ্ক হারিয়ে ফেলছে মনুষ্যত্বের গৌরব! কত ভ্রমরের, কত শর্ম্মিলার সোনার সংসার যাচ্ছে পুড়ে! সাজানো বাগান যাচ্ছে শুকিয়ে!

মানুষের মনের এই তুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষের আত্মাভিমানে বিজ্ঞান দিয়েছে তিনবার নিষ্ঠুর আঘাত। একবার যখন কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিও ঘোষণা করলেন, পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে সৌরজগৎ আবর্ত্তিত হচ্ছে না। পৃথিবী অনন্ত শূন্যে একটী বিন্দুমাত্র। ক্রুদ্ধ পুরোহিতেরা পৃথিবীর এই অবমাননা দেখে গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়বার আঘাত এল যখন ডারউইন ঘোষণা করলেন, মানুষ ভগবান কর্ত্তৃক একটা বিশেষ দিনে বিশেষভাবে সৃষ্ট হয় নি। সে এসেছে ক্রমবিকাশের পথে বনের পশু থেকে। ডারউইনকেও কম আঘাত সহ্য করতে হয় নি পুরোহিতদের কাছ থেকে। তৃতীয়বার মানুষের আত্মাভিমানে আঘাত এসেছে মনস্তত্ত্ববিদদের কাছ থেকে যারা বলছে—মানুষ তার নিজের

ঘরেরও মালিক নয়। তার মনের অবচেতন প্রদেশে যা ঘটছে তার অল্প অংশই ধরা পড়ে মানুষের চেতন মনের কাছে। আমাদের মনের এই দুর্ব্বলতার দিকেই কি লক্ষ্য রেখে ফ্রয়েডের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রলঁ্যা তাঁর উপন্যাস "জঁা ক্রিস্তফ"-এর মধ্যে বলেছেন—A man must watch. For if he slumbers that force rushes into him and whirls him headlong···into what dread abysses? জেগে থাকো, মন, নিশিদিন জেগে থাকো। যদি ঘুমাও অসতর্ক মুহূর্ত্তে ভেসে যাবে তরঙ্গ-সঙ্কুল সেই অকূলে—যেখানে রয়েছে আত্মার মৃত্যু, পৌরুষের সমাধি, মনুষ্যত্বের অবসান, কামনার দুঃসহ দংশন।

———

মালঞ্চ

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে আদিত্য। নীরজা তার স্ত্রী। বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চ'লে গেল অবিমিশ্র সুখে। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই উৎসাহের সঙ্গে বাগানের পরিচর্য্যা করে। আদিত্য কথায় কথায় নীরজাকে বলে, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হ'য়ে দখল জমাতো। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।" কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। নীরজার ঘটলো সন্তান-সম্ভাবনা, এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সঙ্কট। অস্ত্রাঘাত করতে হোলো, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তারপর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালু-শয্যা-শায়িনী বৈশাখের নদীর মত তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হ'য়ে রইলো পড়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে নীরজা দেখে নিজের হাতে তৈরী বাগানের ছবি আর ভাবে বিগত দিনের সুখের কথা।

নীরজা যখন উত্থানশক্তিরহিত হ'য়ে পড়লো—আদিত্য হোলো অসহায়। তাকে বাগানের কাজে সাহায্য করবার জন্য সে নিয়ে এলো সরলাকে। যে মেসোমশায়ের ঘরে আদিত্য মানুষ হ'য়েছিল, তিনি ছিলেন সরলার জ্যাঠামশাই। ফুলবাগানের উপর জ্যাঠামশায়ের সখ ছিল প্রবল আর বাগানের কাজে সরলা ছিল তাঁর সঙ্গিনী। জ্যাঠামশাই নেই। আদিত্য নিঃসহায় সরলাকে এনে তাকে লাগিয়ে দিলো বাগানের পরিচর্য্যার কাজে। যে কাজ ছিল নীরজার, সেই কাজের ভার নিলো সরলা।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আদিত্য ভেবেছিল, সরলা কাছে এলে নীরজার অভাবে বাগানটা নষ্ট হ'য়ে যাবে না। কিন্তু

ইতিমধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যার কথা আদিত্য স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সরলার প্রতি নীরজার মনে জাগলো ঈর্ষা। বিয়ের পর যেদিন নীরজা জানলে আদিত্যের বাগান আদিত্যের প্রাণের মত প্রিয়, সেই দিন থেকে সে ঐ বাগান আর তার মধ্যে ভেদ রাখেনি একটুকুও। বাগানকে সে মিলিয়ে নিলে নিজের মধ্যে। তার সেই সাধের বাগানে আদিত্য নিয়ে এলো সরলাকে। নীরজার মনে হোলো, তার দেহখানাকে চিরে স্বামী তার মধ্যে আর কারু প্রাণকে চালিয়ে দিলে। নীরজার বাগান ছিল নীরজার দেহ। মুখে সে কিছু বল্লে না, কিন্তু দিনে দিনে কান্না তার মনের মধ্যে জমে উঠতে লাগলো। স্ত্রীর অন্তরের খবর স্বামী টের পেলে না। অবশেষে সঞ্চিত বেদনা একদিন চরমে গিয়ে পৌঁছালো। নীরজা স্বামীকে ডেকে একদিন স্পষ্ট করে বললে সরলাকে বাগানের কাজ থেকে ছুটি দিতে। বাগান ছারখার হ'য়ে যাক, ব্যবসা দেউলে হোক একটার জায়গায় যদি দশটা মালি রাখতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই কিন্তু নীরজার বাগানে আর কোন মেয়ের স্থান হতে পারে না। নীরজার অভিযোগ, আদিত্য সরলাকে নীরজার চেয়ে ভালবাসে। তাই সে তাদের দুইজনের বাগানে তৃতীয় ব্যক্তিকে এমন ক'রে টেনে আনতে পারলো। নীরজা স্বামীর কাছে মনের কথা আর গোপন রাখতে পারলে না। পত্নীর আহত অভিমান এবং ঈর্ষার কথা জেনে আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নীরজার, সরলার আর আদিত্যের জীবনে গোলযোগ এতদিনে ভালো ক'রে পাকিয়ে উঠলো। এতদিন আদিত্যের আর সরলার সহজ সম্বন্ধের তলায় যে গভীর ভালবাসা ঢাকা ছিল দু'জনের কেউ তা জানতে পারে নি। সরলার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ীতে আদিত্য আর সরলা জীবন আরম্ভ করেছিল একেবারে এক হ'য়ে। এত সহজ ছিল সেই মিল যে তার মধ্যে কোনও ভেদ কোনও কারণে ঘটতে পারে, সে কথা মনে করাই ছিল অসম্ভব। উভয়ের ছেলেবেলার সম্বন্ধকে

লক্ষ্য ক'রে সরলা বলছে রমেনকে, "ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাইবোনের মতো নয়, দুই ভাইয়ের মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি।" নীরজা রোগে অবসন্ন হয়ে পড়লো ; সরলা এলো আদিত্যের কাছে। এখনও সম্পর্ক সেই আগেকার মতই, যেন দুই ভাই, যেন দুই বন্ধু। সরলা বলছে রমেনকে, "এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি ক'রেই চিরকাল চ'লে যেতে পারতো।" কিন্তু চল্‌লো না। শান্ত নদীতে ঝড় তুল্‌লো নীরজার ঈর্ষা। নীরজা হঠাৎ ধাক্কা মেরে দু'জনকে জানিয়ে দিলো, সরলার আর আদিত্যের সম্পর্ক ঠিক ভাইবোনের নির্ম্মল সম্পর্ক নয়। দু'জনের ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালবাসা নীরজার কাছ থেকে নাড়া খেয়ে ভেসে উঠলো উপরের তলায়। মনের নির্জ্জন প্রদেশে যে রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল এতকাল, হায়! হায়! নীরজার কি প্রয়োজন ছিল সেই রহস্যের সঙ্গে দুজনকে পরিচিত ক'রে দেবার? বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিন। কিন্তু ঈর্ষা বড় ভয়ানক জিনিষ। নীরজা স্বামীর পাশে আর কোন মেয়েকে সহ্য করতে পারলে না।

আদিত্য যখন নীরজার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারলে, সে ভালবাসে সরলাকে, তখন সেই ভালবাসাকে সে অস্বীকার করলে না। সরলাকে কাছে রাখবার জন্য সে মরিয়া হ'য়ে উঠলো। "অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছে থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবেন না।" সরলা যখন বললে, "পায়ে পড়ি, দুর্ব্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ"— আদিত্য উত্তর দিলে, "উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না, ভালবাসি তোমাকে। একথা আজ এত সহজ ক'রে সত্য ক'রে বলতে পারছি, এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল

কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা।"

সরলার চরিত্রের সংযম আদিত্যের চেয়ে অনেক বেশী। ইচ্ছা করলে অনায়াসেই আদিত্যকে আপনার করে রাখতে পারতো। কিন্তু তা সে করলে না। রুগ্না মৃত্যুপথের পথিক নীরজা! সেই অসহায় নীরজাকে এত বড় আঘাত দিতে সরলার প্রাণ স্বতঃই কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো। কিন্তু মুক্তি কোথায়? আদিত্যকেও সে তো কম ভালবাসেনি। এত কাছে কাছে থেকে আদিত্যের কাছ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখা একেবারেই সহজ নয়। "দুই বোন"-এর উর্ম্মিলা দিদি শর্ম্মিলার সংসারকে বাঁচাবার জন্য বিলাত যাত্রা ক'রে শশাঙ্কের দৃষ্টিপথ থেকে আপনাকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে নিলো। বিলাতযাত্রা করবার মতো সরলার অর্থ অথবা সুযোগ ছিল না। কিন্তু এযুগে জেলে যাবার রাস্তা অসংখ্য এবং সহজ। সরলা নীরজার উদ্বেগকে দূর করবার জন্য আদিত্যের দৃষ্টিপথ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে চলে গেল। নীরজার সৌভাগ্যের ভরা-ঘটকে কিছুতেই ভাঙতে দিলো না।

চরম দুঃখ সইতে হোলো নীরজাকে। সে যখন বুঝতে পারলে আদিত্যের চিঠিতে, সরলাকে ভালবাসে তার স্বামী এবং তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার নয়, ব্যাচারা ভেঙে পড়লো একেবারে। নীরজা ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছিল—সে মৃত্যুপথের যাত্রী, বাঁচবে না কিছুতেই। সে যদি জানতো তার মৃত্যুতে স্বামীর অন্তরে থাকবে বিরহের শূন্যতা—এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখে চ'লে যেতে তার কোথাও বাধতো না। কিন্তু একথা যখন সে জান্‌লো, সে ম'রে গেলে স্বামীর অন্তরে কোথাও তার জন্য শূন্যতার বেদনা থাকবে না এবং সরলা সমস্তই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বুক-ফাটা দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নীরজা। তারপর বাধলো নিজের সঙ্গে নিজের দুর্ব্বার সংগ্রাম। সে বুঝলে, প্রাণ খুলে

স্বামীকে যদি সরলার কাছে দিয়ে যেতে না পারে, যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছে সে মরার পরে সেইখানেই ছুঃখের হাওয়ায় যুগ-যুগান্তর তাকে কেঁদে বেড়াতে হবে। সরলাকে ডাকলে সে—গলায় তার পরিয়ে দিলো নিজের মুক্তোর মালা। বললে, "সরলা, শুনেছিলাম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোন মতেই ঘটতে দেবো না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা' কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখবো বেঁধে, ঐ হারটি তারই চিহ্ন।" কিন্তু সরলা আপনাকে জড়াতে দিলে না আদিত্যের সঙ্গে। 'ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেবো না'—এই বলে সরলা নীরজাকে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু দিতে চাইলেই কি নারী তার প্রিয়তমকে আর একজন নারীর হাতে সহজে ছেড়ে দিতে পারে? তাই দেখি মরণের পরেও স্বামীর হৃদয়কে অধিকার ক'রে থাকবার জন্য আদিত্যের কাছে নীরজার কি করুণ মিনতি! "আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালবাসি, সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে সেদিনও তেমনি ক'রেই স্থান দিও। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিও আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি তা হলে তো এখানে আমি থাকৃতে পারবো না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াবো?"

নীরজার জীবনের শেষমুহূর্ত্তটিই সকলের চেয়ে বিষাদময়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সরলা এসে বৌদিদির পায়ে হাত দিতেই পা দ্রুত আপনি গেল স'রে। ভাঙা গলায় মুমূর্ষু নীরজা বলে উঠলো, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারবো না, পারবো না।" তারপর চেপে ধরলো সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হোলো, বললে, "জায়গা

হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব থাকব থাকব।" নীরজার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেল। উপন্যাসেরও সমাপ্তি ঘটলো।

এই উপন্যাসখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সব চরিত্র অঙ্কিত করেছেন তাদের সবাইকেই মনে হয় সুপরিচিত। নীরজাকে চিনি, সরলাকে চিনি, আদিত্যকেও চিনি। নীরজা নারীর চিরকালের মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে সে কত করুণ, কত কোমল! 'ডলি' কুকুরটা যখন মরে গেল—তার মাথাটা নীরজার কোলে! তার মৃত্যু নীরজার মনের উপরে রেখে গেল গভীর বিষাদের ছায়া। আদিত্যের আশ্রিত গণেশের ছেলেটার প্রতি নীরজার স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়ের ভালোবাসার অন্ত নেই। শকুন্তলার মত নীরজার ভালোবাসাও মানুষের জগতকে ছাপিয়ে প্রকৃতির জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ীর দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগত—নীরজার দাক্ষিণ্যের উপরে সবারই অধিকার। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত নিঃসহায় সরলার প্রতি নীরজার আচরণ আমাদের কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে! নেই তার মধ্যে দাক্ষিণ্যের লেশ, নেই সহানুভূতি, নেই উদারতার এতটুকু স্পর্শ। সরলার সব-কিছুর মধ্যেই নীরজা দেখে ত্রুটি। সরলা অলুক্ষুণে মেয়ে। মাঠের মত তার কপাল, ঘোড়ার মতন তার লাফিয়ে চলন। সরলার জন্যই আদিত্যের মেসোমশায়ের সর্ব্বনাশ ঘটেছে—সরলার জন্যই আদিত্যেরও সর্ব্বনাশ ঘটবে। এমন মেয়েকে বিদায় দেবার জন্য নীরজা অস্থির অথচ পাঠক-পাঠিকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সরলা আদর্শনারী। সে গম্ভীর, ক্ষমাশীল, পরিশ্রমী, সংযমী, চরিত্রের দৃঢ়তায় অপরাজেয়। যে নীরজা সরলাকে অপমানের পর অপমান করেছে, সুখের পথের কণ্টক ব'লে তাকে বিদায় দিতে উৎসুক হয়েছে—সেই নীরজার বিরুদ্ধে সরলার কিন্তু উদারতার অন্ত নেই। নীরজার গৃহ থেকে বিদায় নেবার সময় সরলা আদিত্যের হাত ধরে বলল, "আমার হ'য়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন

দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা-ঘট ভেঙে দেবার জন্য।" আদিত্য যখন উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলো, সরলার উপর নীরজার ঈর্ষার কোনই কারণ নেই এবং স্ত্রীর কথায় তাকে বিদায় দেওয়া হবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অন্যায় কাজ—তখনও সরলা আদিত্যের সঙ্গে যোগ না দিয়ে বরং নীরজার পক্ষ সমর্থন করে বল্‌ছে, "তেইশ বছরের কথা বল্‌তে পারিনে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনও কারণ ঘটেনি? সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনও কথা যেন অস্পষ্ট না থাকুক।" সত্যের প্রতি সরলার এমনই অনুরাগ, তার অন্তরের উদারতার সত্যিই অন্ত নেই।

এমন একটি মেয়েকে নীরজা সহ্য করতে পারলো না। শেষ মুহূর্ত্তেও অদ্ভুত গলায় সে ব'লে গেল, "পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলবো তোর রক্ত।" নীরজার এই দুর্ব্বলতা কেবল যে নীরজার একলার দুর্ব্বলতা, তা নয়। এই দুর্ব্বলতা হ'চ্ছে মেয়েদের চরিত্রের একটি সাধারণ দুর্ব্বলতা। মেয়েরা যাকে ভালবাসে, তাকে আত্মসাৎ করতে চায়। রল াঁর নূতন উপন্যাস 'The Combat'এর এক জায়গায় পড়ছিলাম, All women—white, black, yellow or green—have points in common. If they do not see them, it is because half the time they are rivals, they steal men from each other (even though they do not love them it is an instinct which the best of them resist, but which the best of them are aware of). ইংরেজ মেয়ে হোক, নিগ্রো মেয়ে হোক অথবা জাপানী মেয়ে হোক—সব মেয়েরই চরিত্রে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যা সাধারণ। মেয়েরা যাকে ভালবাসে তাকে আপনার ক'রে রাখতে চায়; আর কেউ তাকে দখল

করুক—এটা কিছুতেই তারা বরদাস্ত করতে পারে না। এই জন্য তাদের সব সময় চেষ্টা থাকে, ভালবাসার মানুষটিকে যেন আর কেউ চিলের মত ছোঁ মেরে না নিয়ে যায়। যক্ষের ধনের মত তাকে দুহাতে আগ্‌লে রাখে। পুরুষকে এই আত্মসাৎ করবার অবিরাম চেষ্টা নিয়েই তো সতীনে সতীনে, ননদে ভাজে, শাশুড়ী বৌতে ঘরে ঘরে বিবাদের অন্ত নেই। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হ'চ্ছে মেয়েরা ভালো না বাসলেও অনেক পুরুষের উপরে নিজেদের দখল ছাড়তে চায় না। পুরুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তাদের মন এতই কাঙাল। যাকে তারা ভালবাসে না—তার কাছে থেকেও ভালবাসার অর্ঘ্য নিতে তাদের মনে কুণ্ঠার উদয় হয় না। পুরুষের ভালবাসার জন্য মেয়েদের অন্তরে এই যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা, স্বামীর হৃদয়কে মৃত্যুর পরেও দখল করে থাকবার জন্য এই যে নারীহৃদয়ের অপরিমেয় পিপাসা—এই কান্নাই তো ফুটে উঠেছে মৃত্যুপথযাত্রী নীরজার কণ্ঠে। আদিত্য যখন বললে, নীরু, শরীর নষ্ট করো না। নীরজা বললে "থাক গে আমার শরীর। আমি আর কিছু চাইনে, কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হ'য়েছে তার জন্য আমাকে মাপ কর। কিন্তু আমাকে ভালবাসো, ভালবাসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।" পুনরায় বল্‌লে, 'শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি এবার দেখা হোলে নির্ম্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেবো আপন বোনের মত। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হ'লে সবাইকে আমার ভালবাসা দিয়ে যেতে পারব।" মরণের পথে চলেছে নারী সব-কিছুকে পিছনে ফেলে। তখনও কিন্তু নীরজার মনের আকাশে একটি মাত্র কামনার বস্তু জেগে আছে প্রভাতের শুকতারার মত। এই কামনার বস্তুটি হ'চ্ছে আদিত্যের ভালবাসা। এই ভালবাসা থেকে সরলা যদি নিজের অনিচ্ছাতেও তাকে বঞ্চিত করে, নারী হ'য়ে

নীরজা কেমন ক'রে তাকে ক্ষমা করবে? আদিত্য যদি নীরজার জীবনান্ত-কালের শেষ মুহূর্ত্তগুলি আপনার দাক্ষিণ্য দিয়ে পূর্ণ করে রাখতে পারত, সরলা যে আদিত্যের জীবনে কোনদিন ছায়া ফেলেছিল এই কথা যদি সে নীরজাকে ভুলিয়ে দিতে সক্ষম হোতো, তা হ'লে হয়তো নীরজা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সরলাকে ক্ষমা ক'রে যেতো। কিন্তু আদিত্য সরলার প্রতি অন্তরের লুকানো অনুরাগকে শেষ পর্য্যন্ত নীরজার দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখতে পারলো না। নীরজাকে অক্ষয় বড়ালের 'এষা' পড়াতে পড়াতে আয়ার হাতের চিঠিতে আদিত্য যখন জানালে, সরলা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে--মনটা তার লাফিয়ে উঠলো। পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, আদিত্য তাই চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের পানে চাইলে। চেয়েই বুঝতে পারলে, স্বামীর হৃদয়ে তার স্থান নেই। আদিত্যের উৎসুক হৃদয় তখন অধীর-আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সরলার আগমনের। ঈর্ষায় নীরজার মন পূর্ণ হয়ে উঠলো—কিন্তু সেই ঈর্ষাকে মন থেকে অপসারিত করে হৃদয়কে প্রশস্ত করবার জন্য হতভাগিনী নারী একবার প্রাণপণে চেষ্টা করলে। হাতের মুঠা শক্ত হোলো, বলে উঠলো, "ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।" চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। জয়ী হোলো ঈর্ষা, জয়ী হোলো স্বামীকে মৃত্যুর পরেও নিজের ক'রে রাখবার দুর্জ্জয় কামনা। আশীর্ব্বাদের বদলে নীরজা সরলাকে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলো।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে সরলার প্রতি আদিত্যের হঠাৎ অনুরাগের আতিশয্য দেখে; কতকাল একসঙ্গে কাটিয়েছে দুজনে অথচ নীরজার কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়ার পূর্ব্বে আদিত্য বুঝতেই পারেনি, সরলাকে সে তেইশ বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে। হঠাৎ নীরজার ঈর্ষা তাকে জানিয়ে দিলে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে, কর্ম্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে কেউ সরিয়ে দেয় তবে সেই একাকিকতায়, সেই নীরসতায়

তার সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, তার কাজ পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে। জীবনের সত্যকে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে আদিত্য সরলাকে বল্‌ছে, "সরি আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ? কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল ক'রে? তুমি তো করোনি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা ক'রে সে তো আমি জানি।"

আদিত্যের বেলাতে যা সত্য—সরলার জীবনেও তাই সত্য। সরলা যে পাত্রের পর পাত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার ক'রে এসেছে—তার আসল কারণটা তার নিজের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। তার মনের গভীরে ছিল আদিত্যের প্রতি সুনিবিড় প্রেম। না জেনেও সেই প্রেমের কাছে সে বাঁধা রেখেছিল নিজেকে। হঠাৎ নীরজার আঘাত ভাঙিয়ে দিল তার ঘুম। বুঝতে পারলে নিজেকে; বুঝতে পারলে, বৌদিদির রাগের যথার্থ কারণ আছে। রমেনকে সে বলছে, "হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি, সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্ত্তে। তুমি নিশ্চয়ই সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপর বৌদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারিনি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বৌদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলাম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছো কি?"

মানুষের মনের রহস্য সত্যই অতল—গভীর সমুদ্রের মত অতল। মনের সেই অতলে কত কী যে লুকিয়ে আছে! তাদের কথা আমরা কিছুই তো জানি না। হঠাৎ জীবনে এক একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসে আর সেই ধাক্কা খেয়ে মনের অতল থেকে দু' একটা রহস্য চেতনার আলোকে ভেসে ওঠে। তখন নিজের মনের গোপন সত্যকে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে নিজেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাই। ছেলেবেলাকার

তলিয়ে থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে যখন ভেসে উঠলো উপরের তলায়—তখন সেই ভালবাসাকে আবিষ্কার করে আদিত্য আর সরলা দুইজনেই প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। এমন তাজ্জব ব্যাপারও কি সম্ভব? ভাইবোনের মত দুজনে পাশাপাশি মানুষ হয়েছে, কখনও তো তাদের মনের কোণে এই সত্য উঁকি মারেনি যে তারা পরস্পরকে এমন ক'রে ভালোবেসে এসেছে। অথচ তাদের ভালোবাসার মত এমন সত্যবস্তু আর নেই! নীরজাকে নিয়ে আদিত্য দশ বৎসর সংসার করলে—অথচ এই দশ বৎসর কাল ধরে সরলার প্রতি তার গভীর অনুরাগ তার নিজের কাছেই রইলো অজ্ঞাত।

কেন এমন হয়? সাইকো-এ্যানালিষ্টগণ বলেন, মানুষ তার নিজের ঘরেরও সব খবর জানে না। তার মনের নির্জ্জন প্রদেশে দিবারাত্র চলেছে বিচিত্র চিন্তারাশির অদ্ভুত তরঙ্গলীলা। সেখানে গোপন মনের কত নিবিড় কামনার ঠেলাঠেলি। কত বিবাহিত আদিত্যের মনে ঘুমিয়ে আছে কত সরলার অস্পষ্ট মুখখানি; কত কুমারী সরলার মনে রয়েছে অন্যের স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তি। বাহিরে তারা সমাজের চোখে কত নিষ্কলঙ্ক, অন্তর্য্যামীর চোখে কিন্তু অন্তরের সমস্ত গূঢ় রহস্য অনাবৃত হ'য়ে রয়েছে। ফ্রয়েড লিখেছেন, But men's craving for the grandiosty is now suffering the third and most bitter blow from present-day psychological research which is endeavouring to prove to the ego of each of us that he is not even master in his own house, but that he must remain content with the veriest scraps of information about what is going on unconsciously in his own mind.

মানুষের নিজের সম্বন্ধে প্রকাণ্ড ধারণা আজ তৃতীয়বার নিষ্ঠুর আঘাত পাচ্ছে আধুনিক মনস্তত্ত্বের গবেষণা থেকে। এই গবেষণা থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি, আমরা কেউ নিজের ঘরেরও মালিক

নই—আমাদের মনের গভীরে চেতনার বাহিরে যা চলেছে, তার টুকরো টুকরো সংবাদেই আমাদের খুসী থাকতে হবে। ছেলেবেলায় আমাদের মনের গভীরে এমন অনেক কিছু ঘটে যার সংবাদ আমরা নিজেরাই জানি না। ফ্রয়েড বলেন, The little human being is frequently a finished product in his fourth or fifth year, and only gradually reveals in later years what lies buried in him. চার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিশুমন এমন করেই একজনকে ভালোবেসে ফেলে যে সেই ভালোবাসার ছাপ শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায় আমাদের মনে। কিছুতেই তাকে মুছে ফেলতে পারি না। অদৃশ্য বন্ধনে তার সঙ্গে আমরা আজীবন বাঁধা থেকে যাই। এই যে ছেলে-বয়সের গোপন অনুরাগ—এই অনুরাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত নিজের কাছেও লুকানো থাকে। তারপর ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে হয় তো কারও বিরাগের আগুনের আভায় সেই গোপন অনুরাগ নিজের কাছে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন আর সংশোধনের উপায় থাকে না। নীরজার আর আদিত্যের মধ্যে যে মিথ্যা খাড়া হ'য়ে ছিল—সেই মিথ্যা সহসা ভেঙে যায়। সরলার প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল সহজ সম্বন্ধের তলায়—সেই ভালো-বাসাই আদিত্যের কাছে সকলের চেয়ে সত্য হ'য়ে জেগে ওঠে। হায় অদৃষ্ট! জীবনের পটে প্রথম যে লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে সে লিখে রেখেছিল, সেই লিপিখানি আদিত্য যদি স্পষ্ট করে জানতো—তবে হয় তো সরলার গলাতেই সে বরণমাল্য অর্পণ করতো। কিন্তু নিজেকে আমরা ভালো ক'রে যে জানি না! এইখানেই তো আমাদের বহু দুঃখের মূল নিহিত রয়েছে। আত্মানং বিদ্ধি—তাই সকল দেশের জ্ঞানীদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে। ছেলেবেলাকার জীবনকে নিষ্কলঙ্ক ব'লে উপেক্ষা করা একেবারেই সমীচীন নয়। ছেলে-বেলায় আমাদের মনের গভীরে যারা বাসা বাঁধে—শেষ পর্য্যন্ত

তাদের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠে। এইজন্য ফ্রয়েড বলেছেন, Moreover, the educability of a young person as a rule comes to an end when sexual desire breaks out in its final strength. Educators know this and act accordingly but perhaps they will yet allow themselves to be influenced by the results of psycho-analysis so that they will transfer the main emphasis in education to the earliest years of childhood from the suckling period onward.* ছেলেবেলায় মনের গভীরে যাকে স্থান দিলে উত্তরকালে শিশুর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে—এমন মানুষের উপর শিশুর আসক্তিকে খুব বেশী ক'রে বাড়তে দেওয়া উচিৎ নয়। ফ্রয়েডের মতে ছেলেমেয়েদের মনের যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা খুব শিশুকাল থেকেই সুরু করা সমীচীন। যেখানে এই চেষ্টায় আমরা উদাসীন থাকি সেখানে শৈবলিনীর জীবন হয় ব্যর্থ, দেবদাসের জীবন বিফল হ'য়ে যায়, আদিত্যের প্রেমের জীবনকে আবার নূতন ক'রে সুরু ক'রতে হয়।

———

* Introduction Lectures on Psychoanalysis—P. 268

মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। এই ভুল ধারণার জন্য আমরা নিজেরাও কষ্ট পাই, ওদেরও কষ্ট দিই। মেয়েরা নিজেরাই চায় না—রঙীন চশমার মধ্যে দিয়ে আমরা ওদের দেখি। ওরা পুরুষের মুখ থেকে সত্য কথা শুনতে চায়। যারা সেই সত্যকথা সুন্দর ক'রে বলতে পারে—মেয়েরা তাদের ভালোবাসে। বর্ণার্ড শ' তাঁর নাটকের মধ্যে (Man and Superman) নারী-জাতির সম্বন্ধে এমন সব উক্তি করেছেন যা তাদের গর্ব্বে আঘাত দেয়। তবুও জগৎ জুড়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য নারী-ভক্ত। এটা যে সম্ভব হয়েছে—তার কারণ আছে। শ'য়ের নাটকের মুকুরে মেয়েদের চরিত্রের আসল রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। 'ম্যান্ এ্যাণ্ড সুপারম্যান্ (Man and Superman) নাটকের নায়িকা এ্যান্ (Ann) বিয়ে করলে জ্যাক্‌কে (Jack), অক্‌টেভিয়াসকে (Octavius) নয়। অক্‌টেভিয়াস কবি। সে তার প্রিয়তমাকে সৃষ্টি করেছে নিজের মনের স্বপ্ন দিয়ে। যে নারী সন্তানের জননী হবার জন্য পুরুষের বাহুর মধ্যে হ'তে চায় বন্দিনী—সেই নারীকে সে দেখতে চায় নি বাস্তবের মধ্যে। এরকম স্বপ্নবিলাসী ছেলেদের মুখে নিজেদের স্তুতি শুনে মেয়েদের মন খুসী হয়, সন্দেহ নেই—কিন্তু এদের গলায় মালা দিতে তাদের মনে জাগে কুণ্ঠা। এ্যান্ বল্‌ছে অক্‌টেভিয়াসকে—"You see, I shall have to live up always to your idea of my divinity; and I don't think, I could do that if we were married." অর্থাৎ "দেখ, তুমি মনে কর, আমি মানবী নই। তোমার এই

স্বপ্ন যাতে না ভাঙে তার জন্য সব সময় দেবী হ'য়ে আমাকে জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিয়ে হ'য়ে গেলে তোমার কাছে সব সময় দেবী হ'য়ে তো আমি থাকতে পারবো না।"

মেয়েদের মনের আসল কথাটি বার্ণার্ড শ' ব্যক্ত করেছেন এ্যানের মুখ দিয়ে। যারা মনে করে—নারী শুধু স্বপ্ন দিয়ে গড়া, তাদের মধ্যে মাটির নাম-গন্ধ নেই, তাদের দিকে চেয়ে মেয়েরা মনে মনে হাসে আর ভাবে পুরুষ জাতটা কি বোকা! এমন যদি তারা ভাবে—দোষ দিতে পারি না তাদের; কারণ সব মেয়েই মনে মনে জানে মহামায়ার অংশ সে, পৃথিবীতে এসেছে সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য—to increase, multiply and replenish the earth. মাতৃত্বের জন্য এই যে দুরন্ত ইচ্ছা—এ ইচ্ছার জন্য মেয়েরা নিজেরা দায়ী নয়—দায়ী প্রকৃতি। যে প্রকৃতি মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় ফুল ফোটাবার ঔৎসুক্য জাগায়—সেই প্রকৃতিই মেয়েদের রক্তে জাগায় সন্তান-সৃষ্টির দুর্ব্বার নেশা। এই যে মা হওয়ার জন্য মনের মধ্যে অপরিমেয় পিপাসা—এই পিপাসার কাছে নিজের সুখকে মেয়েরা যেমন নির্ম্মমভাবে বলি দেয়, পুরুষের সুখকেও তেমনি নির্ম্মমভাবে বলি দেয়। সুখ তো তাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে মহাবিশ্ব-জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করা। তাই যে পুরুষদের মনে মনে তারা জানে 'রূপকথার খোকা' ব'লে, তাদের কাছে ধরা দিয়ে পায় তারা আনন্দ. ইকনমিক্সের বই আর শেলীর কবিতা ছেড়ে অন্যের ঘরে গিয়ে ধরে হাতা আর বেড়ী, ছবি আঁকবার তুলি ছেড়ে দিয়ে জীবন্ত ছবি তৈরীর লোভে বেরিয়ে পড়ে পুরুষের সন্ধানে, সেতার আর এস্রাজ নিয়ে সময়ের অপব্যয় না করে সংসার পাতবার দিকে দেয় মন, স্বাধীনতাকে বর্জ্জন ক'রে স্বেচ্ছায় সাজে অন্তঃপুরের সাম্রাজ্ঞী। সন্তানকে নারী যখন গর্ভে ধারণ করে তখনও সে জানে, মৃত্যু

দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রে। জীবনকে বিপন্ন না ক'রে নূতন জীবনকে সৃষ্টি করা অসম্ভব। নারীর মধ্যে জাগে যখন সৃষ্টির কামনা—হারিয়ে ফেলে সে আপনার প্রতি মমতা, নিজেকে দেয় নিষ্ঠুরভাবে বলি।

মেয়েরা ভালোবাসে যাদের—তাদের প্রতিও হয় নির্ম্মম। প্রকৃতির হাতের যন্ত্র হয়ে এসেছে যারা জীব-সৃষ্টির বিপুল উদ্দেশ্যকে বহন ক'রে, পুরুষের সুখ-দুঃখ তাদের কাছে তুচ্ছ। 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান' নাটকের নায়ক ট্যানার মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলছে, "Because they have a purpose which is not their own purpose, but that of the whole universe, a man is nothing to them but an instrument of that purpose." অর্থাৎ "যেহেতু নিজেদের ইচ্ছা বলে কোন ইচ্ছা নেই তাদের আর বিশ্বপ্রকৃতির ইচ্ছা কাজ করছে তাদের মধ্য দিয়ে—সেই হেতু পুরুষ তাদের কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।" কিন্তু মেয়েদের পরিচর্য্যা মুগ্ধ করে না কোন্ পুরুষকে? তার কি কোন মূল্য নেই? ট্যানার বলছে, হাঁ, মেয়েরা পুরুষের যত্ন নেয় সত্য—কিন্তু সৈনিকও তো তার রাইফেলের যত্ন নেয়; বেহালা-বাজিয়েও তার বেহালাকে অবহেলা করে না।' পরিচর্য্যার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হ'চ্ছে ভালোবেসে মেয়েরা পুরুষের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে কিনা। রামী যখন ভালোবাসে চণ্ডীদাসকে, তখন কূল থেকে তাকে টেনে নিয়ে আসে অকূলে—যেখানে আছে কুলত্যাগের সামাজিক কালিমা। বাঘিনী ত্যাগ করতে পারে তার শিকারকে—কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসার মানুষকে ত্যাগ করা অসম্ভব। আর নারী যখন কোমল দুটি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে পুরুষের কণ্ঠ সে বাহুর বাঁধনকে এড়িয়ে যেতে পারে—এমন পুরুষ সত্যই দুর্লভ। সে জানে, বাঁধনকে একবার স্বীকার ক'রে নিলে সে হারিয়ে ফেলবে তার আত্ম-সম্মান,

স্বাধীনতা—সব কিছু। কিন্তু জানলে হবে কি? হরিণও জানে, পাহাড়ে-সাপের কাছ থেকে না পালালে মৃত্যু অনিবার্য্য তার। কিন্তু পারে না পালাতে। সাপের চোখের দুর্জ্জয় মোহিনীশক্তি তার পলায়নের শক্তি করে হরণ। মেয়েদের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পুরুষের নিজের সঙ্গে নিজের যে সংগ্রাম—এই সংগ্রামের মত এমন করুণ-নাট্য বিরল। এই সংগ্রামে পুরুষই হেরে এসেছে বারবার। তার পতনের কাহিনীগুলিতে ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। উর্ব্বশীর পায়ের কাছে কত ঋষি বিকিয়ে দিয়েছে সারাজীবনের তপস্যা। ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য্যে ভুলেছে কত সিজারের মন। ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের নায়ক ট্যানার নায়িকা এ্যানকে বল্লেছে—"The Life Force enchants me: I have the whole world in my arms when I clasp you. But I am fighting for my freedom, for my honour, for myself, one and indivisible." ট্যানারের এত যে প্রাণপণ চেষ্টা পরিণয়-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য—সব চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সাধারণ মানুষের ধারণা, নারীকে পুরুষ করেছে বন্দিনী নিজের ভোগের লালসাকে চরিতার্থ করবার জন্য। শ' বল্লেছেন, এই ধারণা ভুল। মেয়েরাই পুরুষকে করেছে বন্দী। মেয়েদের যে মোহিনী শক্তি—সে তো তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। সমস্ত প্রকৃতি চাইছে সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখতে আর মেয়েরা হোলো প্রকৃতির এই ইচ্ছার মূর্ত্ত প্রকাশ। পুরুষ যখন নারীকে কামনা করে—সে কামনা হোলো তার ব্যক্তিগত সাময়িক খেয়াল। নারী যখন পুরুষকে কামনা করে—সেই কামনার পিছনে থাকে সমস্ত প্রকৃতির দুর্জ্জয় সংকল্প। পুরুষের ব্যক্তিগত খেয়াল বিশ্বপ্রকৃতির সংকল্পের তুলনায় অনেক দুর্ব্বল। নারীর তুলনায় পুরুষ এই জন্যই শক্তিহীন—দেহের দিক দিয়ে নয়, হৃদয়ের দিক দিয়ে। দুজনের মধ্যে লড়ায়ে পুরুষের পরাজয় প্রায় সর্ব্বত্র। মেয়েদের সূক্ষ্ম মোহিনী

শক্তির কাছে পুরুষের স্থূল বাহুবল আর বুদ্ধি হার মেনেছে বারে বারে। ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের নায়ক ট্যানার বল্‌ছে অক্‌টেভিয়াসকে, "They accuse us of treating them as a mere means to our pleasure but how can so feeble and transient a folly as a man's selfish pleasure enslave a woman as the whole purpose of Nature embodied in a woman can enslave a man ?" "মেয়েরা বলে থাকে, পুরুষ চায় তাদের শুধু ভোগ করতে। মানি, একথা সত্য। তবুও স্বীকার করতে হবে পুরুষের এই ভোগের ইচ্ছা সাময়িক এবং সেই কারণে দুর্ব্বল। কিন্তু মেয়েরা তো পুরুষকে চায় না ব্যক্তিগত ভোগের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবার জন্য। পুরুষকে নারীর প্রয়োজন ভোগের জন্য নয়—সৃষ্টির জন্য। তার রক্তের কণায় কণায় জীব-সৃষ্টির উন্মাদনা এবং এই উন্মাদনা তাকে দিয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি। পুরুষ যখন ভোগের নেশায় পাগল হ'য়ে নারীকে চায়—সেই চাওয়ার প্রকৃতি এক রকম। নারী যখন সৃষ্টির বেদনায় অধীর হ'য়ে পুরুষকে চায়—সেই চাওয়ার প্রকৃতি আর এক রকম। পুরুষের চাওয়া নারীকে বিচলিত করতে নাও পারে—কিন্তু নারীর চাওয়া মহাদেবের মনকেও টলিয়ে দেয়। সেই চাওয়ার মধ্যে এমন একটা দুর্ব্বার শক্তি আছে—যে শক্তিকে আমরা আবিষ্কার করি ঝড়ের মধ্যে, ভূমিকম্পের মধ্যে, ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে।

বার্ণার্ড শ' মেয়েদের সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন, তা প'ড়ে রাগ করে এমন মেয়ে বিরল। মনে মনে বরং তারা খুসীই হয়। পুরুষের মুখ থেকে এতদিন তারা হয় শুনে এসেছে,—নারী দিনে মোহিনী আর রাতে বাঘিনী, নয় তো শুনে এসেছে—নারী স্বর্গের ঈশ্বরী, চাঁদের সুষমা আর ফুলের সৌরভ দিয়ে তৈরী, রক্তমাংসের ক্ষুধার লেশমাত্র নেই তাদের প্রকৃতির মধ্যে। এই দুটো বিভিন্ন-প্রকৃতির উক্তির কোনটাই সত্য নয় অর্থাৎ নারী বাঘিনীও নয়, ঈশ্বরীও

নয়—সে মানবী। সে পুরুষের কাছ থেকে শুধু ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে খুসী হয় না। যারা তাকে দূরে দেবীর মহিমার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে কেবল স্তুতি করতে চায়—মেয়েরা তাদের পিঠ চাপ্ড়িয়ে বলে, My dear, you are a nice creature, a good boy. ব্যাস, ঐ পিঠ চাপড়ানো পর্য্যন্ত। শুধু স্তুতি ক'রে মেয়েদের কে কবে মন পেয়েছে? কিন্তু ঘৃণা করেও তাদের মন পাওয়া যায় না। ঘৃণার পাত্র সে তো নয়। পুরুষের সঙ্গ সে চায় নিজের সুখের জন্য নয়—সৃষ্টির জন্য আর সেই সৃষ্টি করতে গিয়ে সে হয় মৃত্যুর সম্মুখীন। আমাদের সকলেরই মা আমাদের সৃষ্টি করবার সময় মৃত্যুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে সৃষ্টি করতে গিয়ে জীবনকে বিপন্ন করে যে—তাকে বাঘিনী আর নরকের দ্বার বলতে লজ্জা হয়।

মেয়েরা যথার্থ যা—তারই কথা শুনতে চায় পুরুষের মুখ থেকে। পুরুষের সবল বাহুর মধ্যে নিপীড়িত হ'য়ে যাদের আনন্দ তাদের সামনে নতজানু হ'য়ে যদি গদগদ স্বরে কেবল ভক্তের স্তব শোনাই—খুসী হবে কেন তারা?

কবিতা লিখবো, ছবি আঁকবো, শেলীর আর রবিবাবুর কাব্য প'ড়ে দিন কাটাবো, ফুল কুড়িয়ে, মালা গেঁথে, পিয়ানো বাজিয়ে, গান গেয়ে নিজের চিত্তবিনোদন করবো, ধর্ম্ম-গ্রন্থের আর ধ্যান-ধারণার মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকবো—কোন তরুণীর মনের গতি এমন অস্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়। এ্যান বল্‌ছে 'The poetic temperament's a very nice temperament, very amiable, very harmless and poetic, I dare say but it's an old maid's temperament." একথা কোন মেয়ে অবশ্য এ্যানের মত মুখ ফুটে স্বীকার করতে চাইবে না—কিন্তু মনের গভীরে সমস্ত মেয়েই জানে, শুধু কাব্যচর্চ্চা আর লোক-সেবা দিয়ে হৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করা যায় না। পুরুষকে ভালো না বেসে তার উপায় নেই।

কিছুদিন হোলো, রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী বইটা হাতে এসেছে।

পড়তে পড়তে বারে বারে মনে হোলো, মেয়েদের চরিত্রের যে রহস্যটুকুর সন্ধান দিয়েছেন বার্ণার্ড শ' তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথার মিল আছে। সুষমার চেহারা সতেজ, সরল, সমুন্নত। রং যাকে বলে কনকগৌর, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা। তার দেহের এই সৌন্দর্য্য দেখে তরুণ সাহিত্যিক ক্ষিতীশ মুগ্ধ হ'য়ে বাঁশরীকে বলছে, "বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনার্ভা, যেন ব্রুনহিল্ড্।" ক্ষিতীশের এই মন্তব্যের উত্তরে বাঁশরী যে উত্তর দিলে তা পড়ে কোন কোন মেয়ে হয় তো চটে যেতে পারে। উত্তরটা কিন্তু ভেবে দেখবার মত। বাঁশরী বললে, "ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের —তোমাদের ভোলানো! পোড়াকপাল আমাদের! এথীনা! মিনার্ভা! মরে যাই! ওগো রাস্তায় চলতে চলতে যাদের দেখেছো পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছো কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্ত্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্চে এথীনা মিনার্ভা।"

বাঁশরীর কথা শুনে হঠাৎ চমকে যেতে হয়। একি আইডিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথের কথা, না রিয়লিষ্ট বার্ণার্ড শ'এর কথা? ক্ষিতীশ বললে, "পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড়োনা। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।" বাঁশরী উত্তর দিলে, "সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদা-মাখা পা ধুইয়ে দিই; নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।" পুরুষকে বিয়ের ফাঁদে ফেলবার জন্য তাকে ভোলাতেই হবে আর তার জন্য মেয়েদের রং মাখতে হয় মুখে। বাঁশরী বলছে ক্ষিতীশকে, রিয়লিষ্ট মেয়েরা। যত বড় স্থূল পদার্থ হওনা, যা তোমরা—তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয়, তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স বানাইনে। রঙ মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব।" পুরুষকে ভোলাবার জন্য মেয়েরা যে রঙ মাখে, এবিষয়ে

কি কোন বিবাহিত পুরুষের সন্দেহ আছে? ইপক্‌মেকিং পিকক্ সাড়ী আর ঝুমকোর মানেটা হলো কি? ছবি আঁকা, গান গাওয়া আর কলেজ যাওয়ার দৌড়ও সবার কাছেই সুবিদিত। বাঞ্ছিত মনের মানুষটী টোপ যেই গিললো, প্লেটো আর ব্রাউনিং রইলো সিকেয় তোলা, মাসিক পত্রিকার গল্পে আর বাঙলা উপন্যাসে এসে জ্ঞান-পিপাসার দৌড় গেল থেমে। শমীবৃক্ষের শাখায় অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের মত অনাদরের মধ্যে দেওয়ালে ঝুলতে লাগলো কুমারী-জীবনের সেতার। সোস্যালিজমের আর দেশসেবার বড় বড় কথা মশারীর মধ্যে প্রেমগুঞ্জনে হোলো পর্য্যবসিত। এ সবের দরকার ছিল পুরুষের মনকে ভোলা-বার জন্য। যাকে ভোলাবার প্রয়োজন ছিল সে যখন হাতের মুঠার মধ্যে এসেছে—আর তো প্রয়োজন নেই টোপ ফেলবার। স্বপ্নের অপ্সরী সাজসজ্জা খুলে রেখে দেখা দেয় সামান্যা মানবী হ'য়ে, মায়াবিনী হয় প্রতিদিনের গৃহিণী। বার্ণার্ড শ'য়ের ভাষায় "She ceases to be a poet's dream and becomes a solid eleven stone wife." অর্থাৎ "কবির স্বপ্ন দেখা দেয় আড়াই মণে নীরেট একটি স্ত্রী হ'য়ে।" কিন্তু বোকাদের ভোলায় কেন মেয়েরা? নিজেরাই বা ভোলে কেন? মহামায়া ভুলিয়ে দেন। ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের নায়ক ট্যানার যখন জিজ্ঞাসা করলে এ্যানকে—"ভালোবাসার সুখের জন্য তুমি বিকিয়ে দেবে স্বাধীনতাকে, সম্মানকে, আত্মাকে?" এ্যান উত্তর দিলে, "It will not be all happiness for me. Perhaps death". অর্থাৎ "সুখ জুটবে না আমার ললাটে। হয় তো মৃত্যু আসবে।" যে-প্রকৃতি মেয়েদের রক্তে দিয়েছে ছেলের কামনা, সেই প্রকৃতিই অন্ধ ক'রে মেয়েদের ছুঁড়ে ফেলে দেয় পুরুষের বাহুর মধ্যে। তাই যাদের ভাবে তারা বোকা, তাদের কাছে শেষ পর্য্যন্ত বিকিয়ে দেয় তাদের দেহ আর আত্মা।

আর এক জায়গায় বাঁশরী বলছে ক্ষিতীশকে, "মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনার্ভার মুখোসটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট

লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়ল পথ-চল্‌তি এক রাজা, সুরু করলে যাদু। কিসের জন্য? টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিষটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজমের কোঠায়।" অনেক পাঠিকা বাঁশরীর এই কথায় আপত্তি করবে—সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবপ্রবণতাকে বর্জ্জন ক'রে যখন সাদা চোখে জগতটার পানে চেয়ে দেখি তখন বাঁশরীর কথাটা কি খুব মিথ্যা ব'লে মনে হয়? হৃদয়টাকে মেয়েরা যখন হারিয়ে ফেলে তখন খানিকটে হিসেব ক'রেই হারায়। যার তার কাছে প্রাণটাকে সহসা বিকিয়ে দেয় না। পিকেটিং করবার সময় রাস্তার ধূলায় দাঁড়িয়ে থাকে সত্যি, কিন্তু বিয়ে করবার বেলায় তারই গলায় মালা দেবার চেষ্টা করে যে তাকে মোটরে নিয়ে ঘোরাতে পারে। যারা দেশের নামে উৎসাহের সঙ্গে দারিদ্র্যচর্চ্চা করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেয়েদের জুড়ি নেই; কিন্তু নিছক আইডিয়ার জন্য কোন মেয়ে নিঃসম্বল আদর্শবাদীকে বিয়ে করেছে—এ দৃষ্টান্ত বিরল। আদর্শের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারে পুরুষ। মেয়েদের কিন্তু "মুনাফা একদিকে, হৃদয়টা আর এক দিকে।" বুদ্ধিমান পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।

মেয়েদের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব আছে। সে হ'চ্ছে অন্যের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার ইচ্ছা। সাইকলজিতে এই ইচ্ছাকে বলে Masochism. এডওয়ার্ড কার্পেনটার বলেছেন, I think every woman, in her heart of hearts, wishes to be ravished; but naturally it must be by the right man. অর্থাৎ পুরুষের বাহুর মধ্যে বন্দিনী হওয়ার ইচ্ছা সব মেয়েদেরই মনে। তবে সেই পুরুষের মধ্যে পুরুষোচিত গুণ থাকা চাই। যার তার হাতে মেয়েরা ধরা দিতে চায় না। দেবী ব'লে ওদের যখন আমরা মাথায় তুলে নাচি তখন সত্যিকারের তৃপ্তি হয় না

ওদের মনে। ওদের তৃপ্তি পুরুষের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে—যে তৃপ্তি লতার বৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে। পুরুষের প্রকৃতি মেয়েদের ঠিক উল্টো। পুরুষ আনন্দ পায় অন্যকে পীড়ন ক'রে, অন্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে। মনের এই রকম ইচ্ছাকে সাইকলজিতে বলে Sadism. ক্ষিতীশ বললে, "মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্ব্বরের প্রতি। পুলকিত হ'য়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্য্যন্ত যেতে রাজি।" বাঁশরী তার কথার প্রতিবাদ করলে না। ক্ষিতীশের কথার উত্তরে বললে, "তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা।।" দুর্ব্বৃত্ত হবার মত জোর নেই যাদের তাদের প্রতি মেয়েদের উপেক্ষা সনাতন।

ঠিক এই ধরণের কথাই সেদিন একখানি বইতে পড়ছিলাম। এখানে তুলে দেওয়া মন্দ নয়। স্ত্রৈণ পুরুষদের চোখ একটু ফুটতে পারে। "A man must appear to be a bully, even if in reality he is nothing of the sort. It is infinitely better for all concerned, particularly for the women." কলেজের ছেলেদের একটু সাবধান হতে বলি। সাড়ির আঁচলের পিছনে পিছনে ছুটলে এসেন্সের গন্ধ পাওয়া যেতে পারে সত্য—কিন্তু মেয়েদের মন পাওয়া তাতে কঠিন হ'য়ে ওঠে। যা সহজে পাওয়া যায়, তার প্রতি ওদের লোভ কম। ওদের অনুরাগ দুর্জ্জয়ের প্রতি। মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াও; অখুসী হবে না ওরা। তোমাকে চা খাওয়াবে, তোমাকে দিয়ে বায়োস্কোপের টিকিট কেনাবে, তোমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে, তোমার জন্মদিনে তোমাকে উপহারও দেবে, কিন্তু হৃদয় তোমাকে কিছুতেই দেবে না। সেটা জয় করা সুকঠিন। ক্ষত্রিয়ের মত যারা ভালোবাসতে পারে তাদের প্রতি মেয়েদের লোভ স্বাভাবিক। বাঁশরী ক্ষিতীশের প্রতি অনুরক্ত হোলো না, অনুরক্ত হোলো সোমশঙ্করের প্রতি। সোমশঙ্করকে

সে বলছে, "শঙ্কর, তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পারো শুধু ভাব দিয়ে নয়, বীর্য্য দিয়ে।" যে প্রেমের মধ্যে পৌরুষ আছে, সেই প্রেমই করে মেয়েদের মনকে আকর্ষণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আসল কথাটী বলতে চেয়েছেন বাঁশরীর মুখ দিয়ে সে হচ্ছে—মেয়েদের প্রকাশ হ'লো ব্যক্তিগত। বাঁশরী বলছে, "আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের।" পুরুষের আত্মপ্রকাশ কোন ব্যক্তির অপেক্ষা করে না। গান্ধী অথবা বুদ্ধ যখন ত্যাগ করেন তখন কোন ব্যক্তির প্রেরণা থাকে না সেই ত্যাগের পিছনে। একটা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ তাঁদের পাগল ক'রে নিয়ে যায় সত্যের পথে। মেয়েরা কিন্তু যখন কোন আদর্শের পিছনে চলে, তখন সেই চলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ। কোন ব্যক্তি নেই, শুধু আদর্শ আছে—এমন অবস্থায় মেয়েদের প্রাণ আদর্শের আহ্বানে কদাচিৎ দেয় সাড়া। গোপা ভিক্ষুণী হয় বুদ্ধকে ভালোবেসে। বুদ্ধ ভিক্ষু হয় সত্যকে ভালোবেসে। কস্তুরীবাঈ কারাগারকে বরণ করে গান্ধীর ভালোবাসার প্রেরণায়, গান্ধী দুঃখ-পথের পথিক হয় সত্যের আহ্বানে। মেয়েরা পুরুষকে আগে ভালোবাসে—তারপর ভালোবাসে তার ব্রতকে। পুরুষ তার ব্রতকে ভালোবাসে সকলের চেয়ে বেশী আর সেই ব্রতকে পালন করতে গিয়ে প্রিয়াকে করে বর্জ্জন। মেয়েদের না হ'লেও পুরুষের চলে। পুরুষের প্রেম না হ'লে মেয়েদের জীবন থেকে যায় অপূর্ণ। ভালোবাসার তাই তারা কাঙাল। সেই প্রেম থেকে যখন তারা বঞ্চিত হয়—কোন বড় ডাকেই তাদের মন দিতে পারে না সাড়া, জীবন অবলম্বনহীন হ'য়ে পড়ে। ব্রাউনিংএর 'In a Balcony' নাটিকায় রাণী বলছে তরুণী Constanceকে,

Constance, I know not how it is with
men.
For women, (I am a woman now like
you)
There is no good of life but love—
but love !
What else looks good, is some shade
flung from love—
Love gilds it, gives it worth. Be
warned by me,
Never you cheat yourself one instant !
Love,
Give love, ask only love, and leave
the rest !

বাঁশরী সোমশঙ্করকে বলছে, 'সত্যি ক'রে বলো আজও কি আমাকে সেদিনের মতই ততখানিই ভালোবাস ?' সোমশঙ্কর বললে, 'ততখানি।' বাঁশরী তখন বললে, 'আর কিছুই চাইনে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করবো না।' সোমশঙ্করের ভালোবাসা না পেলে বাঁশরীর জীবন হ'য়ে যেতো ব্যর্থ। সুষমা পুরন্দরকে ভালোবাসতো তবুও সোমশঙ্করকে বিয়ে ক'রে দুঃসাধ্য ব্রত-সাধনের সঙ্কল্পকে সে যে গ্রহণ করতে পারলো— সে শুধু পুরন্দরের ভালোবাসার যাদুতে। বাঁশরী পুরন্দরকে বলছে, 'সুষমাকে তুমি ভালোবাসো, সুষমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের ?

পুরন্দরের ভালোবাসা পেয়ে সুষমা হলো নির্ভাবনা আর সোমশঙ্করের ভালোবাসা বাঁশরীর মনকে দিয়েছে মুক্তি। পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের জীবনের সকলের চেয়ে বড় অবলম্বন— এই কথাই কি কবি বলতে চেয়েছেন ?

———

চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের আদর্শনারীসৃষ্টির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য। যোগাযোগের কুমু, তপতীর সুমিত্রা, শেষের কবিতার লাবণ্য—সকলের স্বভাবের মধ্যে এমন একটী অনির্ব্বচনীয় শুচিতা ও শোভনতা আছে—যা আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। এই শুচিতা ও শোভনতার সঙ্গে মিশে আছে চরিত্রের দৃঢ়তা আর এই দৃঢ়তার জন্যই স্বভাবের মাধুর্য্য আরও মনোহর হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রগুলি যখন আমরা মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করি—কবির মর্ম্মের কথাটীআমাদের কাছে সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এই কথাটী হচ্ছে—সমন্বয়, সামঞ্জস্য। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যকে মিলিয়েছেন তিনি, নবীনের সঙ্গে প্রাচীনের গাঁট-ছড়া বেঁধে দিয়েছেন তিনি। তাঁর আদর্শনারীর মধ্যে একত্র মিলে গেছে নাইটিঙ্গেল আর সীতা, নিবেদিতা আর দময়ন্তী। পাশ্চাত্যের নারীর দৃপ্ত স্বাধীনতার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মিশে আছে প্রাচ্যের নারীর নম্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সংযম এবং সর্ব্বজীবে উদার সহানুভূতি। স্বাধীনতা প্রেমের ও উদারতার অভাবে কোথাও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় নি; নম্রতা ও কোমলতা দৃঢ়তার অভাবে কোথাও ক্লৈব্য হ'য়ে দেখা দেয় নি।

এলার চরিত্রে একই সঙ্গে এই দৃঢ়তা ও কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। যে শুচিতা এবং শোভনতা কুমু, লাবণ্য ও সুমিত্রার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—সেই নির্ম্মল মাধুর্য্য এলার চরিত্রকেও মনোহর ক'রে তুলেছে। এলার চরিত্রের এই দৃঢ়তা উপলব্ধি ক'রেই ইন্দ্রনাথ তাকে বলেছিল, "কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে

পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।" তবু স্বীকার করতে হবে কুমুকে, লাবণ্যকে কবি যেমন আদর্শ ক'রে তৈরী করেছেন এলাকে তিনি তেমনি আদর্শ করে তৈরী করেন নি। কুমু, লাবণ্য—এরা কবির মানসী কন্যা। এলা তাঁর অন্তরের সবটুকু দরদ পেয়েও কবির মানসী কন্যার গৌরব লাভ করেনি। তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে দেখাবার জন্য। এই বৈশিষ্ট্যকে যেখানে নারী জোর ক'রে চাপাতে গিয়েছে একটা কোন আদর্শের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করবার জন্য সেখানে সে আপন চরিত্রের সম্পূর্ণতাকে খুঁজে পায় নি। এলা আপন নারীস্বভাবের বিশিষ্টতাকে জোর ক'রে বর্জ্জন করতে চেয়েছে। সে চেয়েছে বললে ভুল বলা হয়। ইন্দ্রনাথ জোর ক'রে এমন একটা ত্যাগ তার উপরে চাপিয়ে দিলো—যে ত্যাগ শেষ পর্য্যন্ত তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকেই আগিয়ে দিয়েছে। এই ত্যাগ হচ্ছে নারীর মাতৃত্বের কামনা ত্যাগ। এলা অতীনকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল। সে চেয়েছিল আপন প্রিয়তমকে নিয়ে সংসার পাততে। বিপ্লবী-নেতা ইন্দ্রনাথ তার এই স্বপ্নকে সফল হতে দিলে না। সে চাইলো এলাকে দিয়ে আপন উদ্দেশ্য সফল করতে। এলার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—একথা ইন্দ্রনাথ জানতো। তাই কামিনীকে বসালো সে বিপ্লবের বেদীতে ছেলেদের প্রলয়ের পথে আকর্ষণ করবার জন্য। এলা—নারী। নারী ব'লেই সে বুঝতে পেরেছিল, বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ তার জন্য নয়। বিপ্লবের পথে যারা পথিক হবে তাদের হ'তে হবে সর্ব্বত্যাগী। আদর্শের হোমানলে প্রিয়তমকেও, প্রয়োজন হ'লে, ইন্ধন ক'রে নিক্ষেপ করতে হবে। এলা জানতো, শেষ পর্য্যন্ত তার ভালোবাসাই হবে জয়ী; অতীনের প্রতি সর্ব্বগ্রাসী প্রেম তার আদর্শের প্রতি অনুরাগকে ছাড়িয়ে যাবে। নিজের এই দুর্ব্বলতার দিকে চেয়েই সে নিষ্কৃতি চেয়েছিল দলের বন্ধন থেকে—চিরকুমারী হ'য়ে থাকার বিড়ম্বনা থেকে। ইন্দ্রনাথকে তাই সে বলেছিল, "আপনার

কাছে মিথ্যা বলবো না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্চে।" শুধু নিজে মুক্তি পেলে কি হবে? অতীনকেও যদি ইন্দ্রনাথের দল থেকে মুক্ত করতে পারা না যায় তবে কাকে নিয়ে সে নারীজীবনের প্রেমের স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলবে? তাই সে অতীনকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য ইন্দ্রনাথকে অনুরোধ করছে: 'মাষ্টার মশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।' এই মিনতি এলারই মিনতি। কিন্তু বজ্রকঠোর ইন্দ্রনাথ দুজনের একজনকেও নিষ্কৃতি দিলো না। এলা আর অতীনের মিলনের স্বপ্ন তাই চিরদিন স্বপ্নই থেকে গেল।

এলার চরিত্র সৃষ্টি ক'রে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের স্বভাবের বিশেষত্বটুকু আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। এই বিশেষত্ব বলতে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জৈব প্রকৃতির দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন। এলার মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন এমন সব কথা যা শুনতে প্রথমটা বেখাপ্পা লাগে। কিন্তু বেখাপ্পা লাগলেও এবং মেয়েরা স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করলেও এলার উক্তিতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। অতীনকে বলছে এলা—"নিজেকে ভোলাতে চাইনে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে।" মেয়েরা বায়োলজির সংকল্প বহন ক'রে এসেছে পৃথিবীতে—একথাটা রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম বললেন তা নয়। বার্ণার্ড শ' তাঁর 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান' নামক অতুলনীয় নাটকখানিতে নায়ক ট্যানারের (Tanner) মুখ দিয়ে এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলেছেন। নাটকের উপনায়িকা ভায়োলেট কুমারী অবস্থায় পুত্রবতী হওয়ার কলঙ্কে কলঙ্কিনী হয়েছে। সবাই যখন তার জন্য লজ্জিত তখন ট্যানার বলছে, Here is a woman we all supposed to be making bad watercolour sketches, practising Grieg and Brahms, gadding about to concerts and parties, wasting her life and her money. We suddenly

learn that she has turned from these sillinesses to the fulfilment of her highest purpose and greatest function—to increase, multiply and replenish the earth. অর্থাৎ একটি মেয়ে জীবন এবং অর্থের অপব্যয় করছিল ছবি এঁকে, গান গেয়ে, কনসার্ট শুনে। হঠাৎ সে খুঁজে পেল আপন জীবনের পরম সার্থকতা ;—দেখতে পেল, তার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে সন্তান সৃষ্টি করা। শ' বল্‌ছেন, পুরুষের জন্য নারীর এই যে অনুরাগ—এই অনুরাগের মূলে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ। To her, man is only a means to the end of getting children and rearing them. অর্থাৎ মেয়ের কাছে পুরুষ শুধু সন্তানসৃষ্টির আর সন্তান-পালনের উপায়-স্বরূপ। Sexually, woman is Nature's contrivance for perpetuating its highest achievement. Sexually, man is woman's contrivance for fulfilling Nature's behest in the most economical way. অর্থাৎ, নারী হচ্ছে প্রকৃতির হাতের কলকাঠি আর পুরুষ হচ্ছে নারীর হাতের কলকাঠি। প্রকৃতি নারীকে দিয়ে সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় আর প্রকৃতির সেই আদেশকে শিরোধার্য্য ক'রে নারী খুঁজছে পুরুষের সাহচর্য্য। পুরুষ নইলে নারী তো একা সৃষ্টি করতে পারে না। তবে কি পুরুষের জন্য নারীর এই ভালোবাসা—এর মধ্যে রয়েছে শুধু সন্তান-কামনা ? সীতা কি রামচন্দ্রকে কামনা করেছে শুধু লব-কুশের জন্য ? কণ্বের তপোবনে শকুন্তলা দুষ্মন্তের বিরহে দিনের পর দিন গুনেছে, সে কি ভরতের আশায় ? দীর্ঘকাল ধরে বিরহিণী উমা কঠিন তপশ্চর্য্যা করেছিল শিবকে পাওয়ার লোভে। সেই লোভের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে পাওয়ার কামনা ছাড়া আর কোন কামনাই কি ছিল না ? মহাদেবের জন্য পার্ব্বতীর এত যে অনুরাগ তার লক্ষ্য ছিল কি শুধু কুমারসম্ভব ? সাবিত্রী যমের কাছে শত পুত্র কামনা করেছিল!

সত্যবানকে ফিরে চাওয়া কি সেই শত পুত্রের জন্যই? 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান'-এর উপনায়ক অকটেভিয়াস মেয়েদের সম্পর্কে বলছে, they take the tenderest care of us অর্থাৎ আমাদের জন্য তাদের অনুরাগ অতি নিবিড়, অতি গভীর। ট্যানার উত্তর দিচ্ছে, "হাঁ, তারা আমাদের ভালোবাসে যেমন সৈনিক ভালোবাসে তার বন্দুককে, সঙ্গীতজ্ঞ ভালোবাসে তার বেহালাকে। কিন্তু তারা আমাদের কতটুকু নিজের পথে চলতে দেয়? কোন্ নারী তার প্রেমিককে আর একজন নারীর হাতে অর্পণ করতে পারে? মেয়ের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়লে কোন্ পুরুষের সাধ্য আছে আপনাকে মুক্ত করবার? আমরা বিপদে পড়লে তারা শিউরে ওঠে, আমরা ম'রে গেলে তারা কাঁদে। কিন্তু সে কান্না আমাদের জন্য নয়। যে পুরুষ মরে গেল সে তো একজন পিতা হ'তে পারতো! তার মৃত্যুর জন্য একজন সন্তান জন্মাতে পারলো না! শ'য়ের নিজের ভাষায়, but the tears are not for us, but for a father wasted, a son's breeding thrown away. অর্থাৎ বার্ণার্ড শ' বলতে চান, প্রেম হচ্ছে নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে অতি গৌণ ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে—প্রজাসৃষ্টি। এই প্রজাসৃষ্টির ব্যাপারে নরনারী উভয়েই অসহায় যন্ত্র Life Forceএর নির্ম্মম হাতে। প্রকৃতি দুর্ব্বার আকর্ষণে টানে দু'জনকে দু'জনের পানে। সেই আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের বাহুর মধ্যে দেয় ধরা। জাতিধর্ম্মের বিচার থাকে না; সমাজ সংসার সব মিছে মনে হয়। সসাগরা ধরণীর রাজা বল্কল-পরিহিতা আশ্রমকন্যার কাছে আপনাকে বিকিয়ে দেয়! ব্রাহ্মণ-সন্তান রজকিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

নরনারীর এই যৌন আকর্ষণের ব্যাপারে পুরুষ অগ্রণী—এই ধারণাই যুগ যুগ ধ'রে চলে আসছে! শ'য়ের মতে এর মত ভ্রান্ত ধারণা আর নেই। 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান'-এর নায়িকা য়্যানের প্রেমে পড়েছে অক্টেভিয়াস। অক্টেভিয়াসকে লক্ষ্য ক'রে ট্যানার

বলছে—"You think that you are Ann's suitor ; that you are the pursuer and she the pursued ; that it is your part to woo, to pursuade, to prevail, to overcome. Fool : it is you who are the pursued, the marked down quarry, the destined prey." অর্থাৎ ট্যানারের মতে শিকার হচ্ছে অক্‌টেভিয়াস আর শিকারী হচ্ছে য়্যান। রমণী অনুসরণ করছে পুরুষের—তাকে জয় করবার জন্য। অক্‌টেভিয়াস যখন একথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে তখন ট্যানার আবার বলছে, "Why, man, what other work has she in life but to get a husband ? It is a woman's business to get married as soon as possible, and a man's to keep unmarried as long as he can. You have your poems and your tragedies to work at, Ann has nothing." অর্থাৎ মেয়েদের বর সংগ্রহ ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে ? যত শীগগির পারে মেয়েরা চায় বিয়ে করতে ; পুরুষেরা চায়—যত দীর্ঘকাল সম্ভব অবিবাহিত থাকতে। তোমার কবিতা আছে, নাটক আছে। তাই নিয়ে তুমি জীবন কাটাতে পারো। মেয়েদের কি আছে ? একজন ব্রাউনিং পারে সারা জীবন কবিতা লিখতে। একজন এলিজাবেথের কাব্যজীবনস্রোতে ভাঁটা পড়ে সন্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েরা যে পুরুষের অনুসরণ করছে—এই কথাটি বলতে কবিও পশ্চাৎপদ হন নি। এই নারীপ্রগতির দিনে এটা বলতে পারা খুব সাহসের কথা—সন্দেহ নেই। এলা বলেছে, "মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায় বিচার করবার।" কবি সত্যের অনুরোধে ন্যায় বিচারই করেছেন। এই নিঃশব্দে নৈপুণ্য মাকড়সার কথা স্মরণ করিয়া দেয়।

সে থাকে জালের কেন্দ্রে নীরবে। স্থিরভাবে মাছির প্রতীক্ষা করে। নিঃশব্দ নৈপুণ্যে মাছি ধরাই তার জীবনের পরম সাধনা।

চার অধ্যায়ে নায়িকা এলা অতীনকে আত্মসাৎ করবার বেলায় নারীসুলভ এই নিঃশব্দ নৈপুণেরই পরিচয় দিয়েছে। এলার সঙ্গে অতীনের যে প্রথম পরিচয় তার জন্য দায়ী এলাই। তখন অতীন ষ্টীমারে খেয়া পার হচ্চে মোকামার ঘাটে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী,পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে। ফার্ষ্ট ক্লাস ডেক্-এ সে বেতের কেদারায় বসে আছে। এলা থার্ড ক্লাসের যাত্রী; অঙ্গে ব্রাউন রঙের সাড়ী, খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তার মাথার কাপড় মুখের দুধারে হাওয়ায় ফুলে উঠ্ছে। এমন সময় শঙ্কশর গোপনে থেকে হানলো তার ফুলশর। এলার দৃষ্টি পড়লো অতীনের দিকে। অতীনের মুখ থেকে সে আর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলে না। অপরিচিত যুবকের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তার প্রাণ অধীর হ'য়ে উঠ্লো। কিন্তু কি ক'রে তার সঙ্গে আলাপ করা যায়? একটা ছুতো তো চাই। সেই ছুতো এলো খদ্দর-প্রচারের রূপ ধরে। এলা গিয়ে ধীরে ধীরে উপস্থিত হলো অতীনের কাছে, তার পর চেষ্টাকৃত অসঙ্কোচের ভান ক'রে তাকে প্রশ্ন করলে—আপনি খদ্দর পরেন না কেন? এলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে বিলম্ব হোলনা। তার গলার সুর অতীনের মনের মধ্যে এসে লাগল আলোর ছটার মত। আর কেউ তাকে এমন প্রশ্ন করলে তার রাগের আগুন জ্বলে উঠ্তো। কিন্তু তরুণীর প্রশ্নে তার মন খুসীতেই ভরে উঠ্লো। তারপর সেই খদ্দর-প্রচারের সূত্রকে অবলম্বন ক'রে এক নিমিষে এলার ও অতীনের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক হ'য়ে গেল, সেই সম্পর্ক তরুণ ও তরুণীর মধ্যে চিরকালের সম্পর্ক। এই ক্ষেত্রে কবি আগিয়ে দিয়েছেন এলাকে। বস্তুতঃ অতীন এলাকে চাইবার অনেক পূর্ব্বে এলা অতীনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলবার সঙ্কল্প করেছে। এলা ও অন্তুর এই প্রথম পরিচয়-প্রসঙ্গে এলা বলছে অতীনকে, "ওগো কতবার বলেছি, অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণের

বসে তোমাকে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম, আর কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এলো এই অতিদূর জাতের মানুষটা, চারিদিকের পরিমাপে তৈরী নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটীকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।" এলা যে কথা বলেছে তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এমনি নিঃশব্দ নৈপুণ্যে যুগে যুগে দেশে দেশে মেয়েরা টেনে এনেছে পুরুষকে ভালোবাসার ফাঁদে। নারীর চোখের একটি দৃষ্টিপাতে, কণ্ঠের একটি মাধুর্য্যভরা কথায় পুরুষের সঙ্কল্প গিয়েছে কোথায় ভেসে! সে প্রেমের সাগরে একেবারে তলিয়ে গেছে। আপনাকে হারিয়ে ফেলার সেই চরম মুহূর্ত্তে পুরুষকে বলতে হয়েছে—"তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্ব্ব শরীর চমকে উঠ্‌লো, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে।"

কিন্তু কেন এমন ক'রে পুরুষ আপনাদের বিকিয়ে দেয় মেয়েদের পায়ে? অতীনের মত ধীমান, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন প্রতিভাশালী যুবক—সেও এলাকে পাওয়ার দুর্দ্দমনীয় লোভে যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই অধঃপতনের তীব্র বেদনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে অতীন—কিন্তু প্রিয়াকে পাওয়ার দুর্ব্বার কামনা তাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। তাই ধিক্কার দিতে দিতে তাকে নিতে হয়েছে স্খলিত জীবনের অসম্মান। এলা অতীনের মুখে আপন আকর্ষণ-শক্তির কথা শুনে বললে, "হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানিনে আমার এমন কি শক্তি ছিল।" অতীন তখন 'যে উত্তর দিয়েছিল তা ভগ্নমনোরথ পরাজিত বহু পুরুষেরই অন্তরের করুণ প্রতিধ্বনি। মর্ম্মান্তিক ভাষায় অতীন

এলাকে বললে—"তুমি কি করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ঐ আঙ্গুলগুলি, সত্য মিথ্যে সব কিছুরই পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানিনে কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা—কিন্তু আমার মত বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না।" হায় বুদ্ধি-অভিমানী অতীন, বেদনা শুধু তোমার একার নয়! তোমার কণ্ঠে শুনতে পাই বহু পুরুষের পরাজয়ের আত্ম-গ্লানির ক্রন্দনোচ্ছ্বাস। নিখিল বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে সৃষ্টির ইচ্ছা তরঙ্গিত হচ্ছে নদীর জলধারার মত। সেই ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তির কাছে মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা কতটুকু! শ'য়ের নাটকে ডন জুয়ান বলছে, In the sex relation the universal creative energy, of which the parties are both the helpless agent, overrides and sweeps away all personal considerations, and dispenses with all personal relations. অতীন আপন জীবনের পরাজয় এবং ব্যর্থতার বেদনা পুনরায় প্রকাশ করে বলছে—"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী, বেশী দেরী নেই। তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদু গন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি লুকিয়ে রেখেছিলে আমার হাতে দেবে ব'লে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবন-লীলা সুরু হলো এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তারপর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি-গাম্ভীর্য্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শী আত্ম-বিস্মৃতিতে।" হতভাগ্য অতীন—বুদ্ধি-অভিমানী অতীন শেষ পর্য্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখতে পারলো না। কি ট্র্যাজেডি! জগতের ইতিহাস এমনি অসংখ্য ট্রাজেডিতে ভরা,

আর এই ট্রাজেডির অভিনয় হচ্ছে দিবারাত্র আমাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য নরনারীর জীবনে। ভুবন জুড়ে পাতা রয়েছে মহামায়ার অদৃশ্য ফাঁদ। এই ফাঁদে পড়েনি—এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কয় জন? এই মহামায়াকেই শ' বলেছেন Life Force. 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান'-এর ডন জুয়ান মনের মধ্যে কত তর্ক-বিচার করেছে নারীর মোহিনী মায়াকে জয় করবার জন্য। মনে মনে হাজার বার সে বলেছে মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে কিছুতেই পা দেবো না—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সংকল্প জয়লাভ করতে পারে নি। ডন জুয়ানকে অবশেষে হার মানতে হয়েছে। সেই হারের কথা উল্লেখ করে ডন জুয়ানকে বলতে হয়েছে—"And whilst I was in the act of framing my excuse to the lady, Life seized me and threw me into her arms as a sailor throws a scrap of fish into tha mouth of a seabird." নাবিক যেমন ক'রে সামুদ্রিক পাখীর মুখে মাছ ছুঁড়ে দেয় তেমনি করে মহামায়া পুরুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নারীর বাহুর মধ্যে।

এলা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে খদ্দর-প্রচারের ছুতোয় কেমন ক'রে অতীনের হৃদয়কে আপনার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে এনেছে—সে কথা কবি বেশ অসঙ্কোচেই বলেছেন। নারী যদি এই ছলনার মোহজাল বিস্তার না করতো—কোন বুদ্ধিমান পুরুষ সেই জালে ধরা দিতো না। এই ছলনার দিকে ইঙ্গিত ক'রেই ডন্ জুয়ান য়্যানকে বল্ছে—Come, Ann! do not look shocked! You know better than any of us that marriage is a mantrap baited with simulated accomplishments and delusive idealisations. অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে মানুষ ধরবার ফাঁদ। সেই ফাঁদকে লোভনীয় করবার জন্য অনেক কিছু কৃত্রিম গুণের এবং মিথ্যা আদর্শের ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য মেয়েকে নাচগান শেখানোর ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই যে

সুপাত্র সংগ্রহের ফন্দী, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এত বেশভূষার পারিপাট্য, অলঙ্কারের আয়োজন তাও যে পুরুষকে আকর্ষণ করবার একটা কৌশল—একথা কি অস্বীকার করা যায় ? মেয়েদের প্রকৃতির মধ্যে পুরুষকে ভোলানোর যে একটা নীরব চেষ্টা রয়েছে—এই চেষ্টার দিকে ইঙ্গিত ক'রেই এলা বলেছে, "আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন ক'রে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীব-প্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলি ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।" এই অস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা অভিভূত হয়ে কত পুরুষ বিকিয়ে দিয়েছে নারীর পদতলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য—সব কিছু। এলা অতীনকে আবার বলছে—"আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, তারা বিশ্রী হ'য়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন থাক্‌লেও নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হ'য়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায়, হাবে-ভাবে, বানানো কথায়। মেয়েদের এই সাজ-সজ্জার আড়ম্বর চিরকাল ধ'রে চলে আস্‌ছে আর এই আড়ম্বরের অনেকখানি যে পুরুষের মন ভোলাবার জন্য—এতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। কবি চার অধ্যায়ে মেয়েদের সাজ-সজ্জার এই আড়ম্বরের দিকে কটাক্ষপাত করতে ছাড়েন নি। অতীন বলছে এলাকে—"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বল্‌লুম। পূর্ব্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময় দেশে এলো বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বল্‌লে যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দ্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা) বহু নরনারীর লজ্জা-রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে—লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিল। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশী জামা ছিল তোমার

বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক।” মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই যে অত্যাবশ্যক—এই গূঢ় সংবাদটী কবির পক্ষেই জানা বেশী ক'রে সম্ভব—কারণ তাঁর খাসমহল হচ্ছে মেয়েদের অন্তঃপুরে। আমাদের মত পুরুষেরা হচ্ছি তাঁর বহির্ব্বাটির অতিথি।

এলার চরিত্র অঙ্কিত ক'রে কবি বার বার এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন, মেয়েরা বিশেষ ক'রে ঘরের জন্যই তৈরী। বিয়ে করাটা হচ্ছে মেয়েদের একেবারে স্বভাবের জিনিষ। সৃষ্টির জন্য তারা প্রকৃতির নিজের হাতের যন্ত্র। এই জন্য মনের মানুষটীকে খুঁজে বার করবার দিকে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। পার্ব্বতী চেয়েছে সৌন্দর্য্য দিয়ে শিবের মন ভোলাতে, রাজা অশ্বপতির কন্যা বনে বনে খুঁজেছে সত্যবানকে। কবি এলার মুখ দিয়ে মেয়েদের এই অভিসারের কথা স্বীকার করিয়েছেন। এলা বলছে, “কাব্য-শাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসার-বিধিতে বাধা আছে ব'লেই কবিদের এই কল্পনা। উস্‌খুস্‌-করা মনের যত সব এলো-মেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দ্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।” স্বীকার আমরা অনেক কিছুই করিনে—করলে হৈচৈ পড়ে যায় বলেই করিনে। “If we were to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desires which come into being in the body of a chaste woman, there would be a scandal and an out-cry.” রলাঁর এই কথার মধ্যে মিথ্যা কিছু নেই। “অন্তু, ফার্ষ্ট ক্লাস ডেক্‌-এ যখন অপূর্ব্ব আবির্ভাবের মত আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনো জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল

নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়ীতে সেকেণ্ড ক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষ মুহূর্ত্তে উঠে পড়বো তোমার গাড়ীতে, বলব—তাড়া-তাড়িতে ভুলে উঠেছি।" অন্তুর সঙ্গে নিঃশব্দ নৈপুণ্যে ঘনিষ্ঠতা করবার এই গোপন বাসনা এলা স্বীকার করেছে প্রিয়তমের কাছে। কিন্তু এই স্বীকার করাটা মেয়েদের স্বভাবের একান্ত বিরোধী। ভালোবাসার মানুষ পেলে মেয়েরা তার হাতে ধরা দিয়েই আনন্দ পায়। "জয় করবার সেই গর্ব্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি। বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।" পুরুষের সবল সুদৃঢ় বাহুর মধ্যে বন্দিনী হওয়ার এই দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী তারা নিজেরা নয়—দায়ী মহামায়া, Life Force. এই আকাঙ্ক্ষার পরিণতি যে নিছক আনন্দে, তাও নয়। এর পরিণতি অনেক সময়েই মৃত্যু। মেয়েরা জীবনকে বিপন্ন ক'রেই জীবনকে করে সৃষ্টি। বার্ণার্ড শ'য়ের 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান'-এর নায়িকা এ্যানের পরিণয় সম্পর্কে উক্তি পাঠকের মনের মধ্যে রেখে যায় একটি সকরুণ রেশ। "It will not be all happiness for me. Perhaps death." নায়িকার কণ্ঠের এই উক্তি নাটকের কমেডির মধ্যে নিয়ে এসেছে ট্র্যাজেডির একটা বিষণ্ণ সুর। 'ম্যান এ্যাণ্ড সুপারম্যান'-এর সমস্ত হাস্য ও বিদ্রূপের করুণ-গম্ভীর পরিসমাপ্তি হয়েছে একটা বিরাট মহান উদ্দেশ্যের মধ্যে। সেই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। জীবনের উচ্ছল কলকোলাহলের মধ্যে বাজছে মরণের গম্ভীর নির্ঘোষ। মেয়েদের ভালোবাসার অভিসার প্রেম নিয়ে ছেলেখেলা নয়—সে খেলা মরণ নিয়ে করুণ খেলা। এই খেলার পিছনে রয়েছে মহামায়া, প্রকৃতি, Nature, Life Force. ট্যানারের ভাষায়—Vitality in a woman is a blind fury

of creation. She sacrifices herself to it. সৃষ্টির এই দুর্জ্জয় আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সকল কালের মেয়েরা। এই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে মরণ বরণ করতেও তারা পশ্চাৎপদ হয় না। এই সাড়া দেওয়াই হচ্ছে তাদের স্বধর্ম্ম। দেশের জন্য এলার চিরকুমারী থাকার সংকল্পকে লক্ষ্য ক'রে অতীন যা বলেছে তা কবির কথা। "অধার্ম্মিক তোমার পণ গ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম্ম-বিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙ্গতে তবে সত্য রক্ষা হতো। যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্য্যামীর আদেশ-বাণী, তাকে পায়ে দলিত করেছো; এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।" শাস্তি যে এলাকে পেতে হয়েছে—এ-কথা চার অধ্যায়ের পাঠকদের অজ্ঞাত নেই। পুরুষের জন্য মেয়েদের অনুরাগকে কবি শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন পবিত্র, অন্তর্য্যামীর আদেশ-বাণী। কবি যাকে বলেছেন অন্তর্য্যামীর আদেশ-বাণী, বার্ণার্ড শ' তাকেই বলেছেন, Life Force-এর নির্দ্দেশ—Nature's behest. এই অন্তর্য্যামীর আদেশ-বাণীকে শিরোধার্য্য করে কবি মেয়েদের রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবার অনুরোধ জানিয়েছেন। অতীন বলছে এলাকে, "এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হোলো যে-মেয়েটি রিয়ল। একটুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোমান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারি কেন্দ্রে ব'সে আছ তালপাতার পাখা হাতে।" ঘরের মাঝে ফিরে গিয়ে সেবিকার ব্রত গ্রহণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের কাছে আহ্বান পাঠিয়েছেন। এই সেবিকার ব্রতই বুঝি মেয়েদের সত্যিকারের ব্রত! আর সেইজন্যই এলা অতীনকে বলছে, "নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজী-পড়া মেয়েদের বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় ব'লে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা! আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।" মেয়েরা একান্ত ক'রে ঘরের মানুষ ব'লেই, বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের আনন্দমঠে সন্তানদের দলে টেনে আনবার বিরোধী

ছিলেন ; বুদ্ধ তাদের ভিক্ষুণী করতে এত কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন ; আর রবীন্দ্রনাথ ঘরে থেকে সেবা করাকে মেয়েদের সার্থকতা বলে মেনে নিয়েছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। সুতরাং এইখানেই পরিসমাপ্তির রেখা টানি।

শেষের কবিতা

'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের একখানি অনুপম উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত আর নায়িকা লাবণ্য। এই দুইটি নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র ক'রে আরও কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করা হ'য়েছে ; কিন্তু কবি যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন লাবণ্য আর অমিতের মুখ দিয়ে। এই বলার মধ্যে একদিকে আছে যেমন নিছক কাব্য-লোকের কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা, তেমনি আর একদিকে আছে নরনারীর বাস্তব-জীবনের মিলনের অনেক সমস্যার কথা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য উপন্যাসখানির মোটামুটি একটা আলোচনা করা। এই উপন্যাসখানির মধ্যে প্রেমের যে একটা বিশেষ সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে, সেই সম্পর্কেও দু-একটা কথা বলতে চাই। বলার প্রয়োজন আছে। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এ যুগে কতকগুলো বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে একটি সমস্যা হচ্ছে মানুষের বিবাহিত জীবনের সমস্যা। বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া পুরুষের আর কাউকে ভালোবাসার অধিকার আছে কিনা ? সে

অধিকার যদি পুরুষের বেলায় স্বীকার করা যায় স্ত্রীলোকের বেলাতেও কি আমরা স্বীকার করবো—স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকেও ভালোবাসার তার অধিকার আছে? কঠিন সমস্যা, কিন্তু একে এড়িয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। জীবনে যে সব সমস্যার বাস্তব সত্তা আছে তার সামনে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটা বোঝা-পড়া করে নেওয়াই ভালো। লাবণ্যের ভাষায় "…কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে, ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য—কেননা সেটা অস্পষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তার রাজ্যে অনেক-কিছু বিপ্লবের সৃষ্টি কোরেছেন। আমাদের অনেক-কিছু পুরাতন সংস্কারে তিনি আঘাত দিয়েছেন। কিন্তু 'শেষের কবিতা'য় যে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন তা সাঙ্ঘাতিক। তিনি নরনারীর বিবাহিত জীবনের চিরপ্রচলিত সংস্কারকে দিয়েছেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা।

অমিত ও লাবণ্য উভয়ের জীবনই বৈচিত্র্যময়। অমিত ভালো-বেসেছে লাকণ্যকে, লাবণ্য ভালোবেসেছে অমিতকে। এই দুইটি জীবনের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আর দুইটি জীবন জড়িত হয়ে গেছে। লাবণ্যের জীবনে একদিন এসেছিল শোভনলাল। অমিতের জীবনে এসেছিল কেটী। লাবণ্য আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্ব্বলতা বলে মনে করলে। তার জীবনে শোভনলালের করুণ ভীরু প্রেমের স্থান হোলো না। কিন্তু যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা অনাদরে মরে গেল না—বেঁচে রইলো আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যে। কেতকী মিত্র অর্থাৎ কেটীকে অমিত ভালোবেসে নিজের হাতের আঙটি পরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেটী পেল অমিতের কাছ থেকে অনাদর। সেই অনাদরে তার হৃদয় গেল শুকিয়ে—সে হয়ে উঠলো বিলিতী দোকানের পুতুলের মত বিদেশী আদর্শের সকরুণ ভ্যাঙচানি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কেটী

অমিতকে ভুলতে পারলো না। একদিন সে অমিতের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিল—সেই উৎসর্গিত প্রেমকে সে আর ফিরিয়ে নিতে পারলো না। এমনি বিচিত্র অমিত আর লাবণ্যের জীবন। আমরা ভেবেছিলাম কবি অমিতের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন লাবণ্যকে বিবাহের সুখস্বর্গে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হোলো না। আমরা মনে মনে এঁকেছিলাম লাবণ্যের আর অমিতের মিলনের ছবি; বর আর বধূর বেশে দুইজনে দাঁড়িয়ে, গলায় ফুলের মালা, ললাটে চন্দনরেখা। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন-গড়া সেই বাসর-ঘরকে কবি শিলং পাহাড়ের একটি বনের মধ্যে চির-বিচ্ছেদের শূন্যতার মধ্যে দিলেন মিলিয়ে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লাবণ্য আর অমিত এসে দাঁড়ালো—সেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। সেইখানে অমিতের হাতে লাবণ্য পরিয়ে দিলো তারই দেওয়া আঙটি নিজের আঙুল থেকে খুলে। বললে, 'আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।' সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতের নত মুখের দিকে। একটি নীরব নিবিড় চুম্বন। তারপর লাবণ্য অমিতের জীবন থেকে চিরদিনের জন্য গেল সরে। সন্ধ্যার স্বর্ণরশ্মি পৃথিবীর কাছ থেকে নিল বিদায়; লাবণ্যও অমিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল দূরে—সুদূরে একটি নিঃশব্দ চুম্বনের মধ্যে তার অন্তরের সমস্ত অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে। চেরাপুঞ্জী থেকে অমিত যখন ফিরে এসে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করতে গেল—দেখলে লাবণ্য নেই। লোহার খাটে কেবল একটা গদী আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। সেই ঘরের মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদীর

উপর শুয়ে পড়লো। অমিত বুঝলে, লাবণ্য চিরদিনের জন্য তার জীবন থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে। পাঠকের মন সেই শূন্য ঘরে বিরহকাতর অমিতের সঙ্গে হাহাকার করে ওঠে। অমিতের প্রতি এই নিদারুণ অবিচার করবার কবির কি প্রয়োজন ছিল? শিলং পাহাড়ে অমিতের মোটরের সঙ্গে লাবণ্যের মোটরের ধাক্কা লাগবার ঘটনাটা ঘটিয়ে কবি সেখানেই তো উভয়ের মধ্যে যবনিকা পাত করতে পারতেন। নির্জ্জন পাহাড়ের পথে তাদের মনের সঙ্গে মনের ধাক্কা লাগানোই যদি কবির উদ্দেশ্য ছিল তবে অর্দ্ধ পথে সেই মিলন-পর্ব্বের শেষ না করলে কি চলতো না? শিলং পাহাড় ছাড়া অমিতের বেড়াতে যাওয়ার কি অন্য স্থান ছিল না? মোটরে মোটরে ধাক্কা লাগার এমন বিপদ তো অহরহই ঘট্‌ছে, কিন্তু সেই দুর্ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে দুইটী অপরিচিত তরুণ-তরুণীর এই মিলন না ঘটলেই তো পারতো!

কিন্তু এর জন্য কাবকে অপরাধী ক'রে লাভ নেই। ঠাকুরমার মুখে ছেলেবেলা থেকে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার মিলনের কাহিনী এবং রাজপুত্রের অর্দ্ধেক রাজত্বপ্রাপ্তির গল্প শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। গল্পের মধ্যে তার ব্যতিক্রম হ'লেই আমরা মনে করি একটা কিছু অস্বাভাবিক হ'য়ে গেল। কিন্তু জীবনের আলো-অন্ধকারময় পটভূমিতে অস্বাভাবিক ব'লে কিছুই নেই। যখন যা ঘটবার প্রয়োজন, তাই ঘটে থাকে। কেন ঘটে? কে ঘটায়? এ একটা চিরন্তন রহস্য। আমরা শুধু দেখতে পাই, জীবনের রঙ্গমঞ্চে এমন অনেক-কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যা আমাদের বুদ্ধিতে ঘটা উচিত ছিল না। মৃত্যু এসে দুয়ারে দুয়ারে হানা দিচ্ছে, ভূমিকম্প আর জলপ্লাবন ধ্বংস ব'য়ে আনছে, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালাচ্ছে। এ ঘটনাগুলোকে আমরা চাই না—তবুও ঘটছে। এর উপর আমাদের কোন হাত নেই। এমনি ক'রে ঘটছে মিলনের মাঝে বিচ্ছেদের করুণ পর্ব্ব। সীতা তো চিরদিন অযোধ্যার রাজপুরীতে রাজরাণীর

সুখৈশ্বর্য্য নিয়ে জীবন কাটাতে পারতেন, কিন্তু ঘটনাস্রোতে তিনি ভেসে গেলেন বাল্মীকির তপোবনে। দুঃখের অশ্রুজলের মাঝে তাঁর জীবনের হোলো সকরুণ অবসান। আমরা যদি বলি, বাল্মীকির সীতার প্রতি এই অবিচার করা উচিত হয় নি—তবে তার কোন মানে হয় না। যদি বলি টমাস হার্ডির উচিত হয় নি টেসের মত এমন সুন্দর একটি মেয়েকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া অথবা টলষ্টয়ের উচিত হয় নি রেলগাড়ীর তলায় এ্যানার মৃত্যু ঘটানো—তবে তারও কোন মানে হয় না। মানুষের জীবনের সবটুকু কর্ত্তৃত্ব মানুষের হাতে নয়। কোন্ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি যে আমাদের জীবন নিয়ে এমন খেলা খেল্‌ছে তা আমরা জানি না। আমাদের সাময়িক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এমন এক একটা ঘটনা জীবনে ঘটে যায়,যার ফল হয় বহুদূরপ্রসারী। তা আমাদের জীবনকে দেয় একেবারে বদলে। এমনি একটা দৈব নির্জ্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে অমিত আর লাবণ্যের মনে দেখাদেখির গাঁট বেঁধে দিলে। তারা এখানে দুজনেই অসহায় যন্ত্র এক দুর্জ্জেয় শক্তির হাতে। কবি তাদের মিলিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক কিছুই করেন নি। নর-নারীর পরস্পরের মাঝে কোন্ আদিকাল থেকে রয়েছে এক নিগূঢ় সম্পর্ক যা টানছে উভয়কে উভয়ের দিকে দুর্ব্বার আকর্ষণে। সেই আকর্ষণের পিছনে সৃষ্টির আদিশক্তি পঞ্চশরের খেলা। যে অঙ্গহীন অনঙ্গ বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে—তার শক্তির প্রবল জোয়ারের সামনে নরনারী কোন অকূলে ভেসে যায় ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত। যাদের দুজনের মাঝে নেই পরিচয়ের লেশমাত্র, যাদের নেই ভাষার মিল, জাতের মিল, বয়সের মিল, স্বভাবের মিল—এই আদি-শক্তির অজ্ঞেয় প্রভাবে তারা পরস্পরের বাহুর মধ্যে ধরা দেয় একটি মাত্র মুগ্ধ দৃষ্টির বিনিময়ে। অমিতের সঙ্গে লাবণ্যের মিলন ঘটিয়ে কবি এই অজ্ঞাত আদিশক্তির কাছেই অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। যা ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল, তাই তিনি ঘটিয়েছেন মোটরের

কলিশনকে উপলক্ষ্য করে। যে রহস্যময় দৈব অমিত আর লাবণ্যকে এমনি করে সহসা মিলিয়ে দিলো, সেই দৈবই আবার তাদের মধ্যে এনে দিলো বিচ্ছেদের অশ্রুময় পারাবার। মিলনের মধ্যেও যেমন অস্বাভাবিক কিছুই নেই, বিচ্ছেদের মধ্যেও তেমনি অস্বাভাবিক কিছুই নেই। যা ঘটবার প্রয়োজন ছিল, তাই ঘটেছে তুজনের জীবনে। তাই নিজের আঙুলের থেকে আঙটি খুলে অমিতের হাতে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিয়ে লাবণ্য যখন প্রিয়জনের কাছ থেকে আপনাকে দূরে—অতি দূরে সরিয়ে নিলে তখন অমিতের জন্য সমবেদনায় আমাদের প্রাণ ভরে উঠলেও আমরা আশ্চর্য্য হই না। জীবনের গতিপথ এমনই বৈচিত্র্যময়! মিলনের প্রভাতে সহসা বেজে ওঠে ভৈরবীর সুরে বিচ্ছেদের করুণ রাগিণী। এই বিচ্ছেদের কি কোনই প্রয়োজন ছিল না? প্রয়োজন ছিল বলেই কবি অমিত আর লাবণ্যের মাঝে সৃষ্টি করলেন বিরহের ব্যবধান। শিলং পাহাড়ে সেই যে এক সকরুণ সন্ধ্যায় বনের সবুজ পটভূমিতে দেখতে পাই অমিতের নত-মুখের দিকে লাবণ্য নীরবে আপন মুখ তুলে ধরেছে—এইখানেই কবি তাদের মিলন-পর্ব্বের অবসান ঘটিয়েছেন। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে বনের রঙ্গমঞ্চে কবি ফেলে দিলেন অমিত আর লাবণ্যের যুগল-মূর্ত্তির সামনে নিষ্ঠুর যবনিকা। সেই যবনিকা যখন পুনরায় অপসারিত হোলো তখন দেখি লাবণ্য আর অমিতের মাঝে কাঁদছে বিচ্ছেদের তুস্তর পারাবার। লাবণ্যের জীবনে এসেছে শোভনলাল আর অমিতের জীবনে শ্রীমতী কেতকী মিত্র।

এমনটী ঘটবার প্রয়োজন ছিল বলেই দরদী কবি সৃষ্টি করলেন বিচ্ছেদের অশ্রুসজল পর্ব্ব। আমরা যখন অমিত আর লাবণ্যকে বাসর-ঘরে একত্র দেখবার জন্য অতি মাত্রায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠে-ছিলাম, কবির দরদী মনের উদার কল্পনায় তখন জাগছিল প্রত্যাখ্যাত শোভনলালের এবং প্রত্যাখ্যাতা কেতকী মিত্রের সকরুণ ছবি তু'খানি। অমিত লাবণ্যকে তৈরী করেছিল নিজের মনের মাধুরী

মিশিয়ে। লাবণ্যের মধ্যে যে মেয়েটি ছিল সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে অমিত ভালোবাসেনি—সে ছিল অমিতের দৃষ্টির বাইরে। বিয়ের পর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে লাবণ্যের ছবি অমিতের কাছে হারিয়ে ফেলতো তার মোহিনী মায়া। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়—তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না। অমিত ভাল-মন্দে মেশানো মাটীর মানুষ লাবণ্যকে তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা নিয়ে মেনে নিতে পারতো না। তার ভালাবাসায় আসতো ক্লান্তি ; স্বপ্নের প্রতিমা যেতো বাস্তবের আঘাতে কোথায় মিলিয়ে। সে হ'তো প্রেমের কি সকরুণ ট্র্যাজেডি! দুজনের মধ্যে বিয়ে হোলো না—এ একটা ট্র্যাজেডি বটে। কিন্তু বিয়ে হবার পর অমিত যদি লাবণ্যের প্রতি হারিয়ে ফেলতো তার ভালোবাসা, তার প্রেমে যদি দেখা দিতো ক্লান্তি—তবে সে ট্র্যাজিডি হতো আরও ভয়ঙ্কর। অমিত তার স্বভাবকে বদলাতে পারতো না। কল্পনার লাবণ্য বাস্তবের মধ্যে নিতান্তই সাধারণ হয়ে দেখা দিতো। সেই বাস্তবের লাবণ্যের মধ্যে অমিত খুঁজে পেতো না তার কল্পনাপ্রবণ চিত্তের পরিতৃপ্তি। বিয়ের মধ্য দিয়ে অমিত লাবণ্যকে দেহের দিক দিয়ে খুবই কাছে পেতো সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই পাওয়া কোনদিনই সত্যিকারের পাওয়া হ'তো না।

আসল ট্র্যাজেডি ঘট্‌তো যদি শোভনলাল লাবণ্যকে না পেতো। শোভনলাল লাবণ্যকে নিজের কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি ক'রে ভালোবাসে নি। সে ভালোবেসেছিল প্রিয়াকে তার ভাল-মন্দ সমস্ত মিলিয়ে। লাবণ্য একদিন অগ্নিমূর্ত্তি ধরে শোভনলালকে বলেছিল, 'আপনি কেন এ বাড়ীতে আসেন।' শোভনলাল চোখ নীচু করে বলেছিল, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।' অপমানিত যুবক সেদিন এমন পর্য্যন্ত উত্তর দিলে না যে, লাবণ্যের পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। তারপর বহুদিন কেটে গেলো—কিন্তু অপমানের স্মৃতি আর কালের প্রভাব লাবণ্যের প্রতি শোভনের প্রেমকে কিছুমাত্র ম্লান

করতে পারলনা। বিচ্ছেদের রাতে সেই প্রেম জেগে রইলো অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত। অপমানের মধ্যে অবিচলিত শোভনলালের অনুরাগ উদ্বেলিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের উপরে চাঞ্চল্যহীন প্রভাতের শুকতারার মতই অপলক নেত্রে জেগে আছে। তার মধ্যে নেই ক্লান্তি, নেই বিস্মৃতি, নেই ম্লানিমা। কবি শোভনলালের এই প্রেমের মূল্য দিয়েছেন তার কণ্ঠে লাবণ্যের দেওয়া বরমাল্য পরিয়ে। অমিত লাবণ্যকে পেলো না ;—এই না-পাওয়া আমাদিগকে দুঃখ দেয়। কিন্তু শোভনলালও অমিতের মত লাবণ্যকে যদি না পেতো তবে সেই না-পাওয়া আমাদের মনে কি দুঃখের আরও গভীর রেখাপাত কোরত না ?

শ্রীমতী লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের মিলন ঘটিয়ে কবি যেমন আপনার কল্পনার উদারতার পরিচয় দিয়েছেন অমিতের সঙ্গে কেটীর ছিন্ন যোগসূত্র পুনরায় জুড়ে দিয়ে আপন অনুভূতির বিশালতার অস্তিত্বকেই তেমনি প্রমাণিত করেছেন। এই মিলন না ঘটলে যে অনুদারতা প্রকাশ পেতো তার দ্বারা উপন্যাসের ঔৎকর্ষ্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হোতো। কেটীর প্রথম যে ছবিটা আমাদের চোখে পড়ে তা অবশ্য আমাদের মনে অনুরাগের সঞ্চার না ক'রে বিরাগেরই সঞ্চার করে। বিলিতী মেমের অনুকরণে সে তৈরী ; চোখে মুখে আলাপে ব্যবহারে নেই বাঙালী মেয়ের স্নিগ্ধতা আর মাধুর্য্য ; চালচলনের প্রকাশ পায় ঔদ্ধত্য আর অবিনয়; সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে মাতার বয়সী যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে তার কোন কুণ্ঠা নেই। যে ঠোঁট দুটিতে প্রথম বয়সে ছিল সরল মাধুর্য্য, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মত ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে, চোখে আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। বাঙালীর মেয়ের এই হীন পরানুকরণবৃত্তির উৎকট আতিশয্য দেখে মনের মধ্যে যদি কেটীর প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে, তবে সেটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কেটীর ছবির পাশেই যখন দেখি লাবণ্যের স্নিগ্ধ শোভন ছবি, মুখে

তার নির্লিপ্ত শান্তি, তাতে একটুও রাগ নেই, অভিমান নেই তখন সেই ছবিখানিকে ভালো না বেসে আমরা থাকতে পারি না। লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের বিবাহ হ'লে কি সুন্দরই না মানাতো। সেই বিবাহ যখন শেষ পর্য্যন্ত সত্য হ'য়ে উঠলো না তখন ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটী চাপা দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু কেটীর গভীরতম জীবনের রহস্যের সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই তখন বিতৃষ্ণা রূপান্তরিত হ'য়ে যায় একটী সুগভীর সহানুভূতিতে। কেটীর প্রথম জীবনের সহজসুন্দর ছবিখানি আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অক্সফোর্ডে অমিতের সঙ্গে তার মিলনের সেই মনোহর চিত্রখানিকে ভুলতে ইচ্ছে করে না। সেদিন জুনমাসের জোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা ব'লে উঠেছিল! মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। এমনি এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মনোহর পটভূমিতে কবি অঙ্কিত করেছেন কেটী আর অমিতের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ। অমিত কেটীর হাতে আঙটী পরিয়ে দিলে। কেটীর মধ্যে সেদিন কোন কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল। সে তখন বেশী কথা বলতে শেখেনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অমিতকে কেবল বলেছিল, 'বঁধু'।

তারপর এলো কেটীর প্রতি অমিতের অনাদর। সেই অনাদরের তুষার-শীতল স্পর্শে কেটির হৃদয় গেল মরে। যে কেটী একদিন কুমারী জীবনের প্রথম ভালোবাসা নিয়ে অমিতের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিল—তাকে অমিত আপনার ক'রে রাখলে না। অমিতের মুঠো যখন আলগা হোলো, তখন দশের মুঠোর চাপ পড়লো তার উপরে—তার মূর্ত্তি গেল বদলে; অমিতের কাছে সে পেলো যখন নির্ম্মম ঔদাসীন্য, তার মনকে সে যখন হারিয়ে ফেললো তখন নিরতিশয় অভিমানে অমিতের উপর একটা নিদারুণ প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে দশের মনের মতো করে আপনাকে সাজাতে বসলো। এইখানেই সুরু হোলো কেটীর জীবনের আসল ট্র্যাজেডি। অমিতকে

না পেয়ে সে যদি প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অসহ লজ্জায় তিলে তিলে শুকিয়ে যেত—সে ট্র্যাজেডি এমন ভয়ঙ্কর হোতো না। সে হোতো তার দেহের মৃত্যু। কিন্তু তার ভিতরে মরে গেল যখন কেতকী—বাঙালীর ঘরের নম্রমধুর কেতকী—কেতকী ফুলেরই মত যার অন্তরের সৌরভ ছিল সুস্নিগ্ধ তখনই আসল মৃত্যুর দিকে সে অনেকখানি গেল এগিয়ে। দেহের মৃত্যু এই মৃত্যুর তুলনায় বাঞ্ছনীয়। যেখানে ছিল কেতকীর সুমিষ্ট সৌগন্ধ সেখানে দেখা দিলো গন্ধবিহীন বিলিতী মরসুমী ফুলের রঙের আর বাহারের অস্বাভাবিক আড়ম্বর। কেতকীর এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের রহস্যটুকু আমাদের কাছে যখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তখন মনের মধ্যে বিতৃষ্ণার স্থান এসে অধিকার করে কেটীর প্রতি একটি সুনিবিড় সমবেদনা। এই সমবেদনা আরও সুগভীর হ'য়ে ওঠে যখন দেখি অমিতের এত অনাদর এবং অবহেলা সত্ত্বেও কেটী তার নারীহৃদয়ের ভালোবাসার অপমান করেনি। সেই যে আঠার বৎসর বয়সে অক্সফোর্ডে থাকতে একদিন জুন মাসের জ্যোৎস্নাগর্ব্বিতা এক শর্ব্বরীতে কেতকী বঁধু ব'সে অমিতের কাছে আপনাকে নিবেদন করেছিল—সেই নিবেদিত ভালোবাসার অর্ঘকে প্রিয়জনের অবহেলার মধ্যেও সে আর ফিরিয়ে নেয়নি। সাতবছর ধরে দিবসে নিশীথে অমিতকে দিয়ে এসেছে তার গোপন হৃদয়ের সমস্তখানি প্রেম। শোভনলালের প্রেম অনাদৃত এবং প্রত্যাখ্যাত হ'য়েও যেমন হার মানেনি, অমিতের অবহেলার কাছে কেতকীর প্রেমও তেমনি হার মানলে না। এই প্রেমই কেতকীকে বাঁচালে আসল মৃত্যুর হাত থেকে। নইলে সে হয়তো প্রত্যাখ্যানের অগৌরবের জ্বালায় আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারতো খুসীমত যেখানে সেখানে; প্রেম নিয়ে ছেলেখেলা করতে কোথাও তার বাধতো না। সে ছিল ফ্যাসান-দুরস্ত মেয়ে—লেখাপড়া-জানা বিলাত-ফেরত মেয়ে। বিয়ে করার সুযোগ তার অনেক মিলতে পারতো। কিন্তু হৃদয় একবার দিয়ে আর তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কেতকী তার

আহত প্রেম নিয়ে ডুবে গেল আপনার মধ্যে। সেই প্রেমকে আর কারও কাছে নিবেদন করতে পারলে না তাই সে যখন শিলং পাহাড়ে অমিতকে বললে, "আমিট, তুমি জানো, এই হীরের আঙটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এ আঙটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মূহূর্ত্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।' তখন আপন অজ্ঞাতসারেই হাত দু'খানি সসম্রমে কেটীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করে। এত যে বিলিতী সাজসজ্জা, ইংরেজী আদব-কায়দা, আপনকে বিদেশিনী মেমসাহেবে রূপান্তরিত করবার এত যে সুবিপুল আয়োজন এবং প্রচেষ্টা—সকল কিছুর অন্তরালে জেগে আছে বিরহের বেদনা নিয়ে কেতকীর করুণ-সুন্দর পূজারিণী-মূর্ত্তি। বাহিরের প্রগল্‌ভ বচনপটুতা আর হাসির ছটার পিছনে লুকিয়ে আছে বিরহ-বিধুরার আঁখির জল। তারপর অপমানিতা উপেক্ষিতা কেটী যখন অমিতের দেওয়া আঙটি খুলে টেবিলের উপরে রেখে দ্রুতবেগে চলে গেল, তার এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—তখন এই নারীর গভীর দুঃখে আমাদেরও নিরুদ্ধ অশ্রুজল বাধা মানতে চায় না। এতো বিলিতী মেমের অনুকরণে তৈরী হৃদয়হীন একটা অদ্ভুত জীব নয়; এ যে বাঙালীর ঘরের চিরপরিচিতা অভিমানিনী মেয়ে। প্রাণহীন মর্ম্মমূর্ত্তি বলে যাকে ভুল বুঝেছিলাম, দেখি তার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে অতি সুকোমল নারীহৃদয়। উপর থেকে যার চালচলনকে মনে হয়েছিলো বিলিতী কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স—জীবনকে মনে হয়েছিল ফেরঙ্গকায়দার একটা মাধুর্য্যহীন বিকৃত অনুকরণ—সহসা তার বাহিরের বিলাসিনী-মূর্ত্তির ভিতর আমরা আবিষ্কার করে ফেলি উমার তপস্বিনী মূর্ত্তি। অমিতের সঙ্গে কেটির বিয়ে না হ'লে সত্যই কেটীর জীবন হয়ে যেতো প্রকাণ্ড একটা ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে কবি তাকে বাঁচিয়েছেন অমিতের পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে। লাবণ্যের সঙ্গে অঘ্রাণ মাসে

অমিতের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সে বিয়ে যখন হোলো না, তখন আমাদের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে ওঠে। কিন্তু কেতকীর সঙ্গে অমিতের বিবাহ যদি না হোতো তবে আমাদের ব্যথার অনুভূতি হোতো আরও গভীর, আরও নিবিড়। লাবণ্যের সঙ্গে কেটীর তফাৎ অনেকখানি। লাবণ্যের স্বভাবের মধ্যে ছিল এমন একটা দৃঢ়তা যাতে করে সে সকল দুঃখের মধ্যে অনায়াসে অবিচলিত থাকতে পারতো। কোন বিফলতা, কোন পরাজয় লাবণ্যের জীবনে আনতে পারতো না ব্যর্থতার শূন্য মরুভূমি। শূন্যকে পূর্ণ করবার ক্ষমতা কেটীর ছিল না, লাবণ্যের ছিল। তাই লাবণ্য অমিতকে এত ভালোবেসেও, এত কাছে পেয়েও যখন বুঝলে, প্রিয়তমকে ত্যাগ করে যাওয়াই উভয়ের পক্ষে শুভ হবে আর ত্যাগের ফলে কেটীর জীবনও খুঁজে পাবে তার পূর্ণতা—তখন অমিতকে দলবলসহ চেরাপুঞ্জী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে সুদূরে নেবার যে সঙ্কল্প তার মনে জেগেছিল, তাকে কার্য্যে পরিণত করবার শক্তির অভাব সে অনুভব করলে না।

কেটীর মধ্যে লাবণ্যের এই সবলতার অভাব ছিল। তাই অমিতের প্রত্যাখ্যান তার স্বভাবের মধ্যে আনতে পেরেছিল এমনি একটা বিকৃতি—তার সমস্ত জীবনকে করে তুলেছিল বিষাক্ত। লাবণ্য নীলকণ্ঠের মত অনায়াসে সেই দুঃখের বিষকে গলাধঃকরণ করতে পারত। লাবণ্য আমাদের সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে না—নিজের দুঃখভার নিজেই সে অম্লানবদনে বহন করতে পারে। তাই তার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও সে সহানুভূতি কেটীর প্রতি সহানুভূতির তুলনায় কম। কিন্তু কেটী দুর্ব্বল। তাই সেই দুর্ব্বলতার অনুপাতে তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিও প্রবল। কেটীর সঙ্গে অমিতের বিবাহ না ঘটলে আমাদের মনে থেকে যেত একটী গভীর সমবেদনার অনুভূতি। কবিকে সেজন্য ক্ষমা করা আমাদের পক্ষে সত্যই কঠিন হয়ে উঠতো।

সর্ব্বশেষে অমিত। লাবণ্যকে সে পেলো না, তার জন্য অমিতের

প্রতি আমাদের মনে গভীর সমবেদনার উদ্রেক হয়। চেরাপুঞ্জী থেকে ফিরে এসে লাবণ্যকে দেখতে না পেয়ে তার শরীর-মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটীরে। অমিত কোথাও সান্ত্বনা পেলে না। শিলং পাহাড়ে অমিতের রোরুদ্যমান হৃদয় আমাদের নয়নপ্রান্তে জাগিয়ে তোলে সমবেদনার অশ্রুবিন্দু। কিন্তু ভাগ্যহত কেটীর অশ্রুসজল মূর্ত্তি যখনই আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে তখনই মনে হয়—অমিত যে লাবণ্যকে পেলে না, ন্যায়ের দিক দিয়ে এ ঠিকই হয়েছে। কেটীর প্রতি সে করেছিল দারুণ অবিচার; তাই ভাগ্যের বিচারে লাবণ্যকে সে হারালে। ভালই হোলো। লাবণ্যকে বিবাহ করে সে পরিণামে সুখী হ'তে পারতো না। লাবণ্যের যে মূর্ত্তিকে সে সৃষ্টি করে নিয়েছিল আপনার অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে—প্রতিদিনের ঘরকন্নার বাস্তব রাজ্যে সে হারিয়ে ফেলতো প্রিয়ার সেই মানসী-মূর্ত্তিকে। তখন হৃদয়ে তার দেখা দিতো ক্লান্তি আর নৈরাশ্য। বিচ্ছেদ তাকে এই নৈরাশ্য আর ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচালো। লাবণ্যের সাথে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কেটীর সঙ্গে তার মিলনের পথ হোলো প্রশস্ত। এই মিলনের প্রয়োজন ছিল—নইলে অমিত আমাদের কাছে ছোট হয়ে যেতো কেটীকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে, তার জীবনেও থেকে যেত অপূর্ণতা।

যাক এ সব কথা। এখন যে ব্যাপারটী আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা হয়েছিল সেই আসল ব্যাপারটী নিয়ে আমরা এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিনি। সেই আসল সমস্যাটীর কথা কবি অমিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। উপসংহারে এসে আমরা দেখতে পাই—অমিত আর কেতকীমিত্র বাসর-ঘরের দিকে অনেক দূর আগিয়ে গেছে, আর রামগড় পর্ব্বতের শিখরে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের সংবাদও নির্ভুল নয়। এমনি একটা অবস্থার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যতী আর অমিত। এই দুইজনের কথোপকথন থেকে আমরা বুঝতে পারি, অমিত যদিও কেতকী মিত্রকে আপনার

জীবনের সঙ্গিনী করতে চলেছে—তবুও লাবণ্যের প্রতি তার ভালোবাসা অম্লান গৌরবে বেঁচে আছে—আর সেই ভালোবাসাকে অমিত একেবারেই দোষের ব'লে মনে করে না। এইখানেই কবি পাঠকের মনের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছেন একটা জটিল এবং বিপুল সমস্যা।

আমরা যাকে বিবাহ করি—শুধু তাকেই আমরা ভালোবাসার অধিকারী। জগতে স্বামী শুধু একটি মাত্র নারীকে ভালোবাসতে পারে—সে হচ্ছে তার পত্নী। পৃথিবীতে পত্নী শুধু একটিমাত্র পুরুষকে ভালোবাসতে পারে—সে হচ্ছে তার স্বামী। এই বিবাহের গণ্ডীর বাইরে আর কাউকে ভালোবাসার অধিকার স্বামীর অথবা স্ত্রীর নেই—এই ধারণাই সংস্কার ও শিক্ষার বশে আমাদের মনে দৃঢ়মূল হ'য়ে আছে। শরীরের দিক দিয়ে ভালোবাসার অধিকার তো নে-ই। মনের দিক দিয়েও নেই। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে মনে মনেও ভালোবাসা স্ত্রীর পক্ষে পাপ—মানসিক ব্যভিচার। পত্নী ছাড়া অন্য নারীকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেওয়াও স্বামীর পক্ষে অপরাধ। এমনি একটা সংস্কার যেখানে মনের উপরে করছে আধিপত্য, সেখানে কেটির পাণিপ্রার্থী অমিত অকুণ্ঠিতচিত্তে যতীনকে বলছে, কেটি আর লাবণ্য—দুজনকেই সে ভালোবাসে ; এই দুই জনের কাউকে সে বাদ দিতে চায় না—কারণ তার জীবনে দুজনেরই প্রয়োজন আছে। লাবণ্যকে অমিতের প্রয়োজন অন্তরের মধ্যে সঙ্গ দেবার জন্য, কেটীকে প্রয়োজন সংসারে আসঙ্গ দেবার জন্য। যতী যখন অমিতের দুইজনকেই একই সঙ্গে ভালোবাসার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলো না তখন অমিত বললে, "যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ, যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।" কথাটাকে আরও স্পষ্ট ক'রে অমিত বললে, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়

তোলা জল, প্রতিদিন তুলব প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে। যতী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?" অমিত বললে, "যার হয় তারই হয়,আমার হয় না।" এখানে কবি অমিতের মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন, চিন্তার দিক দিয়ে সেই উক্তি যে বিপ্লবাত্মক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষ একই সঙ্গে দুজনকে ভালোবাসতে পারে কি করে? দুজনকেই যেখানে ভালোবাসার কথা ওঠে, সেখানে একজনকে কি আমরা ফাঁকি দিই না? অমিত লাবণ্যকে ভালোবাসতে গিয়ে কি কেতকীকে ফাঁকি দিচ্ছেনা? অমিত অবশ্যই বলেছে—"কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই কেটিকে বোঝাবো যে, তাকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি না।" পাঠকের মনে কিন্তু সন্দেহ থেকে যায়। লাবণ্যও শোভনলালকে স্বামিত্বে বরণ করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ঘটে—কিন্তু অমিতের কাছে একদিন সে যে প্রেমকে উৎসর্গ করেছিল সেই প্রেমকে বিবাহের পরেও সে অস্বীকার করতে চায় না। বলতে চায় না যে অমিতের প্রতি তার অনুরাগ একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। লাবণ্য বরং বলেছে, একদিন যে প্রেমের অর্ঘ্য সে নিবেদন করেছিল অমিতের কাছে—সেই অর্ঘ্যের কোন পরিবর্ত্তন নেই। সেই প্রেম মৃত্যুঞ্জয় এবং তার জীবনে সবচেয়ে তা সত্য। এখানে লাবণ্যের পক্ষে, শোভনলালকে বিবাহের পরও হৃদয়ে অমিতের প্রতি ভালোবাসাকে অক্ষুণ্ণ রাখা কেমন করে সম্ভব—তাও একটা সমস্যার কথা। মানুষ একই সঙ্গে বহুজনকে ভালোবাসতে পারে কি না—বিবাহের গণ্ডীর বাহিরে ভালোবাসা নিবেদন করবার অধিকার নারী ও পুরুষের পক্ষে থাকা নীতির দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য কি না—এই সব প্রশ্ন মানুষের অন্তরকে চিরদিন ধরে নাড়া দিয়ে এসেছে। মানুষ জিজ্ঞাসা করে এসেছে—ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়েও কি আরও বেশী

জ্যান্ত? এই জিজ্ঞাসায় নানাপ্রকৃতির উত্তর এসেছে নানাজনের কাছ থেকে। কেউ বলেছে—মানুষ ভালোবাসা দিতে পারে একই সময়ে শুধু একজনকে। একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব নয়। সাবিত্রীর পক্ষে সম্ভব শুধু সত্যবানকে ভালোবাসা। আবার কেউ বলেছেন, মানুষের অন্তরের অনেকগুলি দিক আছে। একজন মানুষের পক্ষে আর একজন মানুষের অন্তরের সবগুলি দিককে তৃপ্তিদান করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের দিক দিয়ে কেউ বড়, শক্তির দিক দিয়ে কেউ বড়, বিদ্যার দিক দিয়ে কেউ বড়, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে কেউ বড়—একই সঙ্গে একজনের মাঝে সমস্ত গুণের সমাবেশ আমরা দেখতে পাই না। এই জন্যই একই মানুষের মধ্যে অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই দ্রৌপদীর মতো নারী যদি পঞ্চস্বামীর মধ্যে অন্তরের বিচিত্র দিকের চরিতার্থতা খুঁজে পায়—তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এই যুক্তি দিয়েই অমিত একসঙ্গে কেতকী ও লাবণ্যকে ভালোবাসার ব্যাপারটা সমর্থন করতে চেয়েছে। সে বল্‌ছে—একজনকে ভালো-বাসলে আর একজনকে ভালোবাসা যায় না এই ধারণা ভুল। দীর্ঘ কালের সঞ্চিত সংস্কার আমাদিগকে এইভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। বস্তুতঃ এই পুরাতন সংস্কারকে জয় ক'রে একই সঙ্গে দুইজনকে ভালোবাসা যে সম্ভব—এই সত্যই অমিতকে দিয়ে বলিয়েছেন কবি। অবশ্য সকলের পক্ষেই যে একাধিক ব্যক্তিকে একই সঙ্গে ভালোবাসা সম্ভব—একথা কবি স্বীকার করেন নি। কবির হ'য়ে অমিত যতীকে বলছে—"দেখ ভাই, সব কথা সকলের জন্য নয়। আমি যা বলছি, হয়ত সেটা আমারই কথা।" কেন যে সব কথা সকলের নয় তা আমরা জানি। ভালোবাসাকে শুধু অন্তরের অন্তঃপুরে শ্রদ্ধার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মন থেকে দেহ বেশী দূর নয়। অমিত বলছে, "আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে-স্থলে উপলব্ধি করব, আবার

আকাশেও। নদীর চরে রহিল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়।” অর্থাৎ একজনকে বিবাহ করে আর একজনের প্রতি Platonic love পোষণ করায় কোন দোষ নেই। যার ক্ষমতা আছে, সে একজনকে বিবাহ ক'রে আর একজনকেও মনে স্থান দিতে পারে—যেমন বিবাহিত দান্তের মনে বিরাজ করতো বিয়াট্রিসের ছবি।

মোটের উপর কবি অমিতের মুখ দিয়ে বিবাহ আর ভালোবাসা সম্পর্কে এমন একটা সমস্যার অবতারণা করেছেন যা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই জটিল! এই সমস্যার সমাধান কবি ব্যক্তির উপরেই একান্ত ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। অমিতের মত যে ব্যক্তি লাবণ্য আর কেতকীকে একই সঙ্গে ভালোবাসতে পারে কারও উপর অত্যাচার না করে—তার সেই ভালোবাসার অধিকার অমিতের মুখ দিয়ে কবি প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। যার সেই ক্ষমতা নেই—যে একজনকে ভালোবাসতে গিয়ে আর একজনকে দেয় ফাঁকি—ভালোবাসার নামে প্রেমকে করে দেহের উৎকট কামনার কালিমায় কলঙ্কিত—তার পক্ষে দু'জনকে এক সঙ্গে ভালোবাসতে যাওয়া হবে একটা মারাত্মক ভ্রান্তি। আসল কথা হচ্ছে—ভালোবাসার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করবার জন্য সাধারণ কোন মাপকাঠি থাকতে পারে না। যা একের পক্ষে উচিত, তা অন্যের পক্ষে অনুচিত। এ হচ্ছে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা। ওখানে ধরাবাঁধা কোন নিয়মের রাজত্ব নেই।